এপ্রিল ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

ভারতীয় যাদুঘরের [redacted]

175 বছর

লিখেছেন : কিন্নর রায়

ভ্রমণ ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০্
ধীরেন্দ্রলাল ধর
দুরন্ত যাত্রী ৮্
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গঙ্গাযমুনা ৮্
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
আমাজনের অরণ্যে ৮্
সুনির্মল রায়
চাঁদে পাড়ি ১০
দেবব্রত চক্রবর্তী
চক্রতীর্থে চমক ১০্
সুনির্মল বসু
রোমাঞ্চের দেশে ৬

জীবন চরিত মালা

মণি বাগচি
জীবনীশতক ৩০্
সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ২০্

মণি বাগচী প্রণীত অন্যান্য **জীবনীগ্রন্থ**
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র
পরামাণুবিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ
কৃতী বিজ্ঞানী মেঘনাদ
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমণ
আচার্য জগদীশ চন্দ্র
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
মহাত্মা রামমোহন
ও অন্যান্য জীবনী সিরিজ
প্রতিটি ১০ টাকা

কিশোর রচনাবলী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৪০্
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০্
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
শার্লক হোমস্-এর কিশোর সমগ্র ৩০্
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫্
মেঘনাদ সাহা
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২্
সত্যেন্দ্রনাথ বসু
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫্
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোর গল্প সমগ্র ৩০্

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫্
অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স *ফিকশন* ১৫্
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮্
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মেঘনাদ ১০্
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮্
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীল মানুষের কাহিনী ১০্
শিশিরকুমার মজুমদার
নাখনাটিয়ার রহস্য

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ 1ম সংখ্যা
এপ্রিল 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : আবহাওয়া নিয়ে সমস্যা ॥ সমরজিৎ কর ॥ 7
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ভারতীয় যাদুঘরের 175 বছর ॥ কিন্নর রায় 19
পড়াশোনা : অঙ্ককথা ॥ নিখিল রঞ্জন বালা 65 : বৈদ্যুতিক বাতি ও তার ব্যবহার ॥ সমীর কুমার ঘোষ 17 : চলন ও গমন ॥ দীপঙ্কর দত্ত 51
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : মৎস্য পুরাণ ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 31
অভিযান : অ্যান্টার্কটিকা ॥ অরুণ কুমার রায় 47
জীবজন্তু : সাপ যেখানে বন্ধু ॥ দীপঙ্কর পাল 41
গাছপালা : মানি প্ল্যান্টের জীবন ধারণ ॥ কমল কুমার মৈত্র 28
শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা : তেজস্ক্রিয়তায় শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ॥ নিত্যগোপাল বসু 30
পৃথিবী ও সম্পদ : কাগজের কতকথা ॥ কার্তিক ঘোষ 27 : অ্যাসবেসটস্ ॥ পবিত্র পাল 29
নিজে নিজে কর : মডেল এর রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 15 মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 16 : মডেল সমস্যা ও সমাধান ॥ মলয় খাটুয়া 53 : প্রোটেকশন সার্কিট ॥ মলয় খাটুয়া 54
ফিচার ও ছবিতে গল্প : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার 43 : বসন্তের অগ্রদূত কোকিল ॥ অজয় হোম 11 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 12, 13 : কীট পতঙ্গের কথা ॥ অলয় ঘোষাল 55 পৃথিবীর বৃহত্তম পুষ্প ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 58
আবিষ্কারের গল্প : বেতার যন্ত্রের জন্মকথা ॥ ননীগোপাল মণ্ডল 39 আয়নার ইতিহাস ॥ বাচ্চু মুখার্জী 49
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : সিনেমা দেখা ॥
বিতর্ক : আলোর চেয়ে দ্রুতগামী—ট্যাকিওন ॥ সৌমিত দাস 9
ধারাবাহিক রচনা : বোর্ণিওর বেরী ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 35
ছড়া : সুমিত্রা খাঁ, কমল চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ দত্ত রায় ॥ 38
প্রতিযোগিতা : কুইজ কনটেস্ট 56 : আইকিউ-টেস্ট ও শব্দকূট 57 : বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 57
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : পরিষদের খবর 59 : সফল উত্তর দাতাদের নাম 59 : লোভী দেশলাই কাঠি ॥ অপরাজিত বসু 61 : বিজ্ঞান সংবাদ 66 বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 63 : বিজ্ঞানের খবর 61

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
লিখবেন
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভেন্দু শেখর ভট্টাচার্য
জহর মুখোপাধ্যায়

ভূমিকম্প
কারণ ও প্রতিকার

প্রধান সম্পাদক : **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক : **রবীন বল**
সহ সম্পাদক : **জয়ন্ত দত্ত**

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং পি-21 চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত।
দাম : 5·00 টাকা

চিঠিপত্র

পড়াশোনা

1988 আগস্ট মাসের পত্রিকার 18 পৃষ্ঠায় মাননীয় অমরনাথ রায় মহাশয় 'ম্যাগনেসিয়াম' সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে কিছু অসংগতি আছে। প্রথমতঃ. তিনি 'ম্যাগনেসিয়াম' নামক ম্যাগনেসিয়ামের একটি সংকর ধাতুর কথা উল্লেখ করেছেন, যার উপাদানগুলি হল ম্যাগনেসিয়াম (30%) এবং অ্যালুমিনিয়াম (70%)। কিন্তু আমি অনেকগুলি বই লক্ষ্য করেও 'ম্যাগনেসিয়াম' নামক কোন সংকর ধাতুর উল্লেখ পেলাম না। ম্যাগনেসিয়ামের একটি সংকর ধাতু হল ম্যাগনেসিয়াম ; যার উপাদান অ্যালুমিনিয়াম (98%) এবং ম্যাগনেসিয়াম (2%)। আমার মনে হয় ম্যাগনেসিয়াম নামক কোন সংকর ধাতু নেই। আমার অনুরোধ লেখক যেন বইটির নাম উল্লেখ করে পাঠান, যাতে ঐ সংকর ধাতুর নাম উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, লেখক আবার লিখেছেন ম্যাগনেসিয়াম জলে দ্রবীভূত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। কিন্তু আমি শ্রদ্ধেয় সুখেন্দু মাইতির মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান (দশম শ্রেণী)-তে দেখলাম, সাধারণ উষ্ণতায় ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া হয় না। উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে জলীয় বাষ্প (H_2O) চালনা করলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। $Mg + H_2O = MgO + H_2 \uparrow$। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের কোন কথা ঐ বইতে উল্লেখ নেই। লেখক যেন বইয়ের নাম উল্লেখ করে জানিয়ে দেন।

মোঃ ওমর আহমেদ, সৈদপুর, টাকী, 24-পরগণা (উঃ)

আগস্ট 1988 সংখ্যায় সৌরভ দে 'সব ফুলের রং এক হয় না কেন ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর লিখেছেন, সেই উত্তর স্পষ্ট এবং মনঃপুত উত্তর নয়। আমার মনে হয় উনি যদি নিম্নলিখিত উত্তরটি লিখতেন তাহলে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হত না।

সব ফুলের রঙ এক হয় না। কারণ, সূর্যরশ্মির বর্ণ সাতটি রঙ দ্বারা গঠিত। যদি লাল ফুলের উপর সূর্যরশ্মি পড়ে বা কোন সাদা আলোক পড়ে তবে ঐ ফুল সাত রঙের মধ্যে শুধু লাল রঙ-এর আলো ছাড়া অন্যান্য রঙের আলো শোষণ করে নেয়, ফলে ঐ ফুল থেকে শুধু লাল রঙ-এর আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে ; তাই লাল ফুলকে আমরা লাল দেখি। আবার সবুজ ফুলের ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির সাতটি রঙের সবুজ রঙ ব্যতীত অন্য রঙ শোষণ করে, ফলে সবুজ রঙ প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে এবং ঐ ফুলকে সবুজ দেখায়।

মোঃ ওমর আহমেদ, সৈদপুর, টাকী, উঃ 24-পরগণা।

ভলকান এবং এক্সগ্রহ-1 ও এক্সগ্রহ-2 সম্পর্কে

গত জানুয়ারী (1989) সংখ্যায় বলতে পারো কেন বিভাগের একটি প্রশ্ন ছিল, সৌরজগতে আজ পর্যন্ত কতগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে ? তার উত্তরে বলা হয়েছে, "সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা 10 কিম্বা 11টি।" কিন্তু আমি

উপগ্রহ

জানুয়ারী '89 সংখ্যায় এই পত্রিকার "বলতে পারো কেন ?" বিভাগটিতে (60 পৃ) কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করলাম, এতে বৃহস্পতির উপগ্রহ গুলির নাম দেওয়া হয়েছে—গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো, ইউ-রোপা, অ্যামালথিয়া, থিবি, আইও. লেডা, হিমালিয়া, লিসিথিয়া, এলারা, আনাঙ্কে, কার্মে, প্যাসিপি, ওমিনোমে।

সম্ভবতঃ বৃহস্পতির সপ্তম উপগ্রহ লেডা নয় ওটি হবে নেডা, একাদশ উপগ্রহ আনাঙ্কে নয় অ্যানাঙ্কে, চতুর্দশ উপগ্রহ ওমিনোমে নয় সিনোপে এবং প্লুটোর দুটি উপগ্রহের একটির নাম চারণ নয় ক্যারণ।

এবং ইউরেনাসের উপগ্রহের সংখ্যা 15 না 21 কোন্‌টি জানালে বিশেষ বাধিত হব।

ঋত্বিক লাহা, আলিগ্রাম, বর্ধমান।

কমপিউটার

এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ হল কমপিউটারের কলা-কৌশল'। আধুনিক যুগ হল কমপিউটার যুগ।

এই বিষয়টিকে আরো আকর্ষণ করে তোলা যায়, যদি আপনারা এই বিভাগে থিওরি বেসিসে কমপিউটার 'Language'-এর সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেন। যেমন BASIS, COBOL etc. তাহলে ভাল হয়। থিওরি বেসিস ছাড়াও এই বিষয়কে আরো আকর্ষণ করে তোলা যায় যদি প্রতি সংখ্যায় এক্‌টি বা দু'টি করে কোনো 'Computer Language বা 'graphics-এর ওপর কোন Solved programme দেওয়া হয়। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি তাহলে আমার মতন আরো অনেকে উপকৃত হবে।

অরিন্দম ভট্টাচার্য, শম্পামির্জা নগর, বজবজ রোড, উঃ 24-পরগণা।

জানাই যে, সৌর জগতে আজ পর্যন্ত নয়টি গ্রহই আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তরে আরও বলা হয়েছে যে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের মতে দশমগ্রহ ভলকান। কিন্তু ভলকান গ্রহকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। 1865 সাল নাগাদ দুইজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী—ল্য ভেরিয়ে এবং লেসকারবো যুগ্মভাবে ভলকান নামে এক গ্রহ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা গ্রহটির পরিচয়ও দিয়েছিলেন প্রায় "স্পষ্ট" (?) করে। বলা হয়েছিল, এর ব্যাস 1600 কিমি. সূর্য থেকে গ্রহটির গড় দূরত্ব প্রায় 2 কোটি 8 লক্ষ কিমি. এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় প্রায় 19 দিন 18 ঘণ্টা। কিন্তু তথা-কথিত ভলকানকে সূর্য পৃষ্ঠে অতিক্রম করতে কখনও দেখা যায় নি—না ল্য ভেরিয়ে নির্দেশিত কোনও সময়ে, না অপর কোনও সময়ে। উপরন্তু 1878 সালে পূর্ণ সূর্য-গ্রহণ ও পরবর্তী কয়েক দশক ধরে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কালে কখনও ভলকানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এই গ্রহকে অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণ করেন দুইজন মার্কিন বিজ্ঞানী—ওয়াটসন এবং সুইফট্।

উত্তরে বলা হয়েছে, "সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, প্লুটোর পরে সূর্যের আরও দুইটি গ্রহ আছে—এক্স-1 এবং এক্স-2।" ত্রিরিশের দশক নাগাদ প্লুটো আবিষ্কৃত হওয়ার পর সোভিয়েত বিজ্ঞানী রাদজিয়েভস্কি বলেন যে, মহাকাশে আরও দুটি গ্রহ আছে। বিস্ময়ের কথা, তিনি তখনও গ্রহ দুটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি। তাই তিনি গ্রহ দুটির নাম দিয়েছিলেন এক্স গ্রহ-1 এবং এক্স গ্রহ-2। তিনি আরও বলেন, গ্রহ দুটির ভর পৃথিবীর ভরের যথাক্রমে 400 এবং 240 গুণ। সূর্য থেকে গড় দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় 2400 কোটি এবং 3000 কোটি কিলোমিটার। এক্সগ্রহ-1 দক্ষিণাবর্ত এবং এক্সগ্রহ-2 বামাবর্ত। পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে প্রথমটির কৌণিক ব্যবধান প্রায় 37° এবং দ্বিতীয়টির 60°। কিন্তু এরা যেহেতু এখনও প্রমাণিত হয় নি, তাই গ্রহের সংখ্যা 10 কিম্বা 11টি নয়।

সৌভিক আচার্য, লালবাগ, মতিঝিল রোড, মুর্শিদাবাদ।

আবিষ্কারের গল্প

'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার ডিসেম্বর 1988 সংখ্যায় প্রকাশিত লতিকা দত্তের "কলম কে আবিষ্কার করেন?" শীর্ষক আবিষ্কারের গল্পটি পড়লাম। লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর কলম আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনীর জন্য। কিন্তু নিবন্ধটি আবিষ্কারের গল্প হিসেবে বলতে গেলে কিছু কথা না বলে পারছিনা।

প্রথমতঃ লতিকা দেবী ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কার কাল বলেছেন, 1880 সাল। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে ওটা হবে 1884 সাল।

দ্বিতীয়তঃ "কলম কে আবিষ্কার করেন?" তাঁর এই প্রশ্নসূচক শিরোনামের উত্তরটি কোথাও বলে যান নি। অসংখ্য পাঠক পাঠিকার মনেও প্রশ্ন থেকেই গেল "কলম কে আবিষ্কার করেন?

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য উৎসাহী পাঠক পাঠিকার উদ্দেশ্যে বলি 1884 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এল. ই. ওয়াটারম্যান প্রথম ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করেন। আর বলপেন আবিষ্কার করেন হাঙ্গেরীর এল. বীরো এবং জী. বীরো, 1938 সালে।

ননীগোপাল মণ্ডল, বামনসরিষা, লালনগর, মেদিনীপুর-721424

গত ডিসেম্বর (88) সংখ্যার সৌমেন্দু পালের 'পরিবেশ ও আমরা' সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে বলেছেন "পর্বতের উপর বনাঞ্চল থাকলে উচ্চ-বৃক্ষের ডালপালার উপর শীতকালে সঞ্চিত তুষার রাশি গ্রীষ্মের প্রথম থেকেই গলতে শুরু হত, ফলে গ্রীষ্মের সময় নদীগুলিতে যথেষ্ট জল পাওয়া যেত, খরার প্রকোপ তাতে দূর হত।" এটা কখনই সম্ভব নয় কারণ—পর্বতের উপর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত গাছপালা জন্মে। যে সমস্ত উচ্চতায় গাছপালা জন্মে, সেই এলাকায় বরফ জমে না, বরফ জমে সাময়িক তুষারপাতের ফলে। বরফ জমার জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন সেই উচ্চতায় গাছপালা জন্মানো সম্ভব নয়, সুতরাং আমার মনে হয় ঐ যুক্তি দিয়ে খরার প্রকোপ হতে দূর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅর্ধেন্দু বিকাশ পাত্র, গোপীনাথপুর মেদিনীপুর।

মডেল নির্মাণ

ডিসেম্বর 1988তে প্রকাশিত 'নিজে নিজে কর' বিভাগে দেবকুমার রায়ের কম খরচে হাই ভোল্টেজ সার্কিটে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করলাম। প্রথমত AC 128-এর B.C ও E উল্লেখ করা উচিত ছিল, কারণ AC 128টিকে ঘুরিয়ে ধরলে উহার C ও E চেঞ্জ হয়ে যায়, এর ফলে সার্কিটটি কার্যকরী হয় না। দ্বিতীয়ত 16 watt-এর বাল্বটির V উল্লেখ করা উচিত ছিল কারণ এখানে যদি কেউ 10 watt 220 V-এর বাল্ব দেয় তাহলে সেটা জ্বলবে না। এখানে 100 V-এর মত হয় আবার এটা 50 সাইকেলস্‌ও নয়।

অমিত কুমার বল্লভ, বীরা বল্লভ পাড়া, উত্তর 24-পরগণা।

জানা-অজানা

নভেম্বর 1988 সংখ্যায় **"আশ্চর্য ইন্টারকম"** মডেলটি পড়লাম। কিন্তু এটার পূর্ণ রূপ দিতে গেলে কমপক্ষে ৪টি তারের প্রয়োজন। এককে দিকে থাকবে 2টি করে স্পিকার। যার একটি কাজ করবে রিসিভারের এবং একটি স্পিকারের। ফলে 4টি স্পিকারের জন্য তার লাগবে 4 [চার] টি। এবং যদি এর সাথে হর্ণ লাগানো যায় তবে আরও চারটি তার লাগবে। ফলে বাইরে তারের পরিমাণ অত্যধিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি এমন মডেল জানতে চাই যাতে এই কাজগুলো মাত্র দুটো তারেই সম্ভব।

রঞ্জিত সিংহ, শিক্ষক পল্লী, গাজোল মালদা।

'ডিসেম্বর 1988' সংখ্যায় "জানা-অজানা" বিভাগে জয়দেব ঘোষ মহাশয়ের "মরুভূমির সঙ্গীত" রচনায় এক জায়গায় একটি ভুল তথ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। রচনাটিতে তিনি বলেছেন যে, মরুভূমিতে কখনও কখনও বিশাল বালিয়াড়ীর ঢালে ধস নামলে এক ধরনের 'বুম' 'বুম' আওয়াজের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মরুভূমিতে খুব কমই ধস নামে এবং ধস নামলেও প্রকৃতই ঐ রকম কোনও আওয়াজ শোনা যায় না। সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকণা বিশরণ (Grannular Disintegration) এর ফলেই ঐ ধরনের আওয়াজ শোনা যায়। মরুভূমির শিলায় নানারকম খনিজ পদার্থ থাকে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থের প্রসারণ ও সঙ্কোচন বিভিন্ন রকম হয় বলে শিলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন টানের সৃষ্টি হয় এবং শিলাটি অকস্মাৎ আওয়াজ করে ফেটে যায়। এই প্রক্রিয়ায় শিলা টুকরো টুকরো হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলা কণাতে পরিণত হয় বলে ইহাকে ক্ষুদ্র-কণা বিশরণ বলে। সূর্যাস্তের পর শিলার সংকোচন-প্রসারণ অধিক ঘটে বলে এইরূপ শিলা ফাটবার আওয়াজ পাওয়া যায়। তাই বলা হয় মরুভূমিতে সূর্যাস্তের পর প্রতিদিন পিস্তলের আওয়াজ হয়।

বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র ও পার্থসারথি প্রামাণিক, সিউড়ী, বীরভূম।

ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় "নিজে নিজে কর" বিভাগে প্রকাশিত "ব্যাটারী চার্জার সার্কিট ডায়াগ্রামে আমরা কয়েকটি ভুল লক্ষ্য করলাম। এখানে ভুলগুলির সংশোধন করলাম—

(i) চার্জারের ট্রান্সফর্মারটি 2 Amper হবে। এবং 2 Amp 6V ও 2 Amp 12V ব্যাটারী চার্জ হবে।

(ii) ডায়োডের (–) ঋণাত্মক পয়েন্ট ট্রান্সফরমারের সঙ্গে ঝালাই করতে হবে। এবং (+) ধনাত্মক পয়েন্ট থেকে (+) পয়েন্ট বের হবে।

(iii) ব্যাটারী 6 – 12 ঘণ্টা চার্জ দিতে হবে।

(iv) এই সার্কিটের সাহায্যে 6V 1 Amp ব্যাটারী ও চার্জ করা যাবে। তবে ব্যাটারী বেশী দিন টেকসই হবে না। এই ভুলগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

রাজা মুখার্জী ও আদিত্য মণ্ডল
কাঁস্তোরমোসা, শক্তিগড়, বর্ধমান।

সাপের মাথায় মণি

ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় 'বলতে পার কেন' বিভাগে ঝন্টু চৌধুরির "সাপের মাথায় কি মণি থাকে ?" প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন যে, এটা নিছক কবির কল্পনা।

এর প্রতিবাদে জানাই যে সাপের মাথায় মণি থাকে। এই ব্যাপারে একটি সত্য ঘটনা জানাচ্ছি।

আমাদের খড়্গপুর, নিউ ডেভেলপ-মেণ্ট রেল কোয়ার্টারে নিজেদের বাগানের এক গর্ত থেকে গত 15-12-88-ত মেদিনীপুর জেলার সবং অঞ্চলের অধিবাসী শ্রী সুকুমার ঘোষ নামক একজন বেদে একটি কালকেউটে ধরেন। এবার আমার মা, পাড়ার কাকিমা, জেঠিমা ও ছোট বড় বিজ্ঞানের ছাত্রদের সকলের ও আমার চোখের সামনে তিনি (বেদে) সদ্য ধরা সাপটির মাথার উপরে আঁশের তলা থেকে ব্লেড দিয়ে কেটে লাল রঙের ছোট ছোট চারটি মণি বের করেছিলেন। ভদ্রলোক কোনো তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র ও হাত-সাফায়ের কাজ করেন নি। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে লাখ দুলাখ সাপের মধ্যে থেকে এই রকম একটি সাপে মণি পাওয়া যায়। এবং তাঁরা এই মনিগুলি কলকাতার জুয়েলারিতে' চড়া দামে বিক্রি করেন।

এই বিষয়ে সত্যতার যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে পারেন।

বীথিন চক্রবর্তী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর,

গত ডিসেম্বর '88 সংখ্যায় 'প্রাণি জগতে এমন কোন প্রাণী কী আছে —যার পুরুষেরা সন্তান প্রসব করে ?' – এই প্রশ্নের উত্তরে সুধাংশু পাত্র মহাশয় যা বলেছেন আমি অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে চাই। উনি একপ্রকার উভলিঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু আরেক ধরনের উভলিঙ্গ প্রাণী আছে যারা সময়ে সময়ে পুরুষ বা স্ত্রী-র ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় 'কেঁচো' নামক প্রাণীদেহে। একটি কেঁচো কোন এক সময় অপর কেঁচো থেকে শুক্রাণু গ্রহণ করলেও, অন্য সময় শুক্রাণু প্রদান করে অন্য কেঁচোকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কেঁচো মাঝে মাঝে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে, আবার মাঝে মাঝে স্ত্রী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সুব্রত চৌধুরী, নৈহাটী 24-পঃ উঃ।

আবহাওয়া নিয়ে সমস্যা

সমরজিৎ কর

খবরটা হয়ত তোমরাও জান—ভারত সরকার নতুন দিল্লিতে নতুন ধরনের একটি কম্পিউটার বসিয়েছে। কম্পিউটারটির নাম ক্রে এম পি একস্ / 14। এই কম্পিউটার নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অঙ্ক সমাধান করতে পারে, লক্ষ লক্ষ তথ্য বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারে সে সব তথ্যের মূল বক্তব্যই বা কি। কম্পিউটারটির স্মৃতি-শক্তিও সাংঘাতিক। কোটি কোটি তথ্য নিজের মগজে ধরে রাখতে পারে। আর হুকুম করলেই যে তথ্যটি তুমি চাও, তোমাকে তা জানিয়েও দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জটিল কাজের সমাধান বের করতে ব্যবহার করবেন এই কম্পিউটার। কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগান। বিশেষ করে অনেক আগে থেকে পূর্বাভাস।

সত্যি কথা বলতে কি অনেক আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগানর কাজটি বড়ই জটিল। আপাতত যে সব যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা হয় তাতে বড় জোর সকালের দিকে বলে দেওয়া যায় বিকেল অথবা রাতের আবহাওয়া কেমন যাবে। কোন কোন সময় দু তিন দিন আগেও তা বলা যায়। বলে দেওয়া যায় কোথায় কখন আবহাওয়ার তাপমাত্রা কেমন দাঁড়াবে, কুয়াশা হবে কিনা। কখন বৃষ্টি হতে পারে। বলে দেওয়া যায় প্রবল বর্ষণ হবে —না হাল্কা বর্ষণ। চব্বিশ ঘণ্টা থেকে দু তিন দিনের মধ্যে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে কিনা মোটামুটি ভাবে তাও বলে দেওয়া হচ্ছে এখন। বলে দেওয়া যায় সাগর-মহাসাগরের কোন অঞ্চলের বাতাসে চলবে নিম্নচাপ, সেই নিম্ন চাপের দরুন সৃষ্ট হবে ঘূর্ণিঝড়। যাকে কোথাও বলা হয় টরনেডো, কোথাও টাইফুন, কোথাও বা হারিকেন। সেই ঘূর্ণি ঝড়ের শক্তি কতটা প্রবল হবে এবং কোন পথ ধরে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তাও বলে দেওয়া যায়। এ ধরনের খবর আগে ভাগে জানলে যে সব জায়গা দিয়ে ঘূর্ণিঝড় যাবে সেখান থেকে মানুষজন, গৃহপালিত পশু এবং অস্থাবর সম্পত্তি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায়। এ ধরনের পূর্বাভাস যোগান হচ্ছে ঠিকই, তবে অনেক সময় যা বলা হয় ঘটনার সঙ্গে তা মেলে না। অনেক সময় বলা হয়, ব্যাপক অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। কিন্তু সঠিক কোন অঞ্চলে বৃষ্টি হবে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয় না। অনেক সময় বলা হয় প্রচুর বর্ষণ হবে। কিন্তু কতটা বর্ষণ হবে তাও বলা যায় না। এর ফলে ঠিকমত সাবধান হওয়াও শক্ত হয়।

ভারতীয় আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন নতুন এই কম্পিউটারটির সাহায্যে এ ধরনের অসুবিধেগুলিই তাঁরা দূর করতে চান। হয়ত জানাতে পারবেন—তিন থেকে দশদিন অথবা তারও আগে ঠিক কোন কোন জায়গার আবহাওয়া কখন কেমন দাঁড়াবে—কখন হবে বৃষ্টি, ঝড় এবং কুয়াশা—তাপমাত্রায় হবে পরিবর্তন। কখন কোথায় বরফ পড়বে—কতক্ষণ ধরে পড়বে—এমন অনেক খবর।

বড় শক্ত কাজ। অনেকেই হয়ত জান, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় ভূমিকা সূর্যের। সূর্যের উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ে। বাড়ে সমুদ্র তলের তাপমাত্রা। ভূ-পৃষ্ঠ এবং সমুদ্র তলের স্পর্শে যে বাতাস থাকে তখন তার তাপমাত্রা বাড়ে। বাষ্পীভূত হয় জলে। জলীয় বাষ্প হাল্কা বলে ঊর্ধাকাশে ধাবিত হয়। বাতাসও গরম হলে হাল্কা হয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। অথবা ভূ-পৃষ্ঠে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠে যে অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল সে দিকে প্রবাহিত হয়। জলীয় বাষ্প আকাশে গিয়ে ধূলি-কণার সংস্পর্শে এসে সৃষ্টি করে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টি। বাতাসের তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প এবং চাপ—প্রধানত এই তিনটির উপর নির্ভর করেই অঙ্ক কষে বিজ্ঞানীরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস যুগিয়ে থাকেন।

সূর্যের অবস্থান কখন কোথায় কেমন দাঁড়াবে তার উপর নির্ভর করে কোন অঞ্চলের আবহাওয়া। কোন অঞ্চলের মাথার উপর বা তার কাছাকাছি সূর্য এলে সে অঞ্চলে পড়ে গরম, দূরে সরে গেলে সেখানে পড়ে শীত। এ ছাড়াও আরো অনেক ঘটনার উপরও নির্ভর করে, আবহাওয়ার মতিগতি। বন-জঙ্গল কমে যাওয়ায় আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। বন কেটে বাড়ানো হয়েছে চাষের জমি। জমিতে যতক্ষণ ফসল থাকে, অসুবেধে নেই। কিন্তু ফসল তোলার পর বাতাস ধূলোবালিতে যায় ছেয়ে। এর ফলে বাতাসের

তাপমাত্রা পাল্টায়। প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে রয়েছে অজস্র আগ্নেয়গিরি। মাঝে মাঝে তাদের বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর গভীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসা তাপ উষ্ণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের জল—বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে। বিস্ফোরণের ফলে মহাসাগরের জল প্রচণ্ড ভাবে আন্দোলিত হয়। বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন 'এল নিনা'। এর প্রভাবও পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর পড়ে। ঊর্ধাকাশে ওজন স্তর কমছে। এর দরুন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা বাড়ছে অতিরিক্ত অতিবেগুনী রশ্মির স্পর্শে এসে। ওজন স্তর অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে। কিন্তু তা হাল্কা হলে অতিরিক্ত অতিবেগুনী রশ্মি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে এসে পড়ে, তাকে করে তোলে উত্তপ্ত। কাঠ, জীবাশ্ম জ্বালানি, অর্থাৎ কয়লা খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ান হচ্ছে অনেক বেশি। ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড বেড়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ অবলোহিত রশ্মি বা উত্তাপ এ সব গ্যাসের মধ্যে পড়ে বাঁধা, দূরাকাশে চলে যেতে পারে না। এর জন্যেও আবহাওয়ার তাপমাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এ সব ঘটনার ব্যাপারে অজস্র তথ্য জানা গেলে কম্পিউটারের সাহায্যে তাদের বিশ্লেষণ করে তবেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগান সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কলকাতার কথাই ধরা যাক। এখানে কবে কখন কেমন আবহাওয়া চলবে যদি তিন দিন আগে তা জানতে হয় তা হলে সারা পৃথিবীর অজস্র অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে হবে অজস্র তথ্য। অত তথ্য মানুষের পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, এক মাত্র ক্রে এম পি একস্ / 14-এর মত কম্পিউটারের পক্ষেই সম্ভব। তা ছাড়া, কখন কোথায় কি কি কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে পারে সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা দরকার। জানা দরকার সেই কারণগুলির উপর নির্ভর করে কি করে জানা যায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।

অনেক আগে থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন জানা দরকার?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ তাতে যানবাহনের নিরাপত্তা বাড়ান যাবে, ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে প্রাণ বাঁচান যাবে আগে থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে। কৃষক বর্ষার আগমন দিনটি সঠিক জেনে নিয়ে সেই মত চারা তৈরি, বীজ বপন অথবা ফসল কাটার সুযোগ পাবে। এতে চাষের উৎপাদন বাড়বে। হয়ত ক্ষেতে ফসল কিছুটা পেকেছে, এমন সময় জানা গেল ঝড় বা বন্যা আসছে। এমন অবস্থায় ক্ষেতের ফসল কেটে নিলে কিছুটা ফসল তো পাওয়া যাবে। পুরোপুরি অপচয় হবে না। এর জন্যেই বিজ্ঞানীরা এখন আবহাওয়া নিয়ে এত ভাবছেন।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 5·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা—হাতে 45·00, পোস্টে (Under Certificate of Posting) 50·00 টাকা। শারদ সংখ্যার মূল্য পৃথক।

● M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞানরচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

● পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।

● সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।

● প্রেরিত রচনা সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

● অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

বিশেষ ঘোষণা

নিউজপ্রিন্ট ও আনুসঙ্গিক মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার মূল্য এপ্রিল সংখ্যা থেকে 50 পয়সা বৃদ্ধি করা হল। পাঠক ও গ্রাহকবর্গের কাছ থেকে আমরা আগের মতোই সহযোগিতা পাব আশা করি।—সার্কুলেশন ম্যানেজার

আলোর চেয়ে দ্রুতগামী, 'ট্যাকিওন'

সৌমিত দাস

আইনস্টাইন ও আলোর গতি :—আমরা জানি, গতির জগতে আলোর গতিই সর্বোচ্চ। এটা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আলোর গতি শূন্য মাধ্যমে সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল।

আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে, কোন বস্তুর যদি স্থির ভর হয় Mo এবং গতিভর হয় M, তাহলে সে বস্তুকে v গতিতে তুললে সম্পর্ক দাঁড়াবে এরকম, যখন c হলো আলোর গতি,—

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{C^2}}}$$

স্বাভাবিকভাবেই যখন বস্তুর গতি হবে আলোর গতির সমান, অর্থাৎ $V = C$, তখন বর্গমূলের মধ্যের আশংটির মান দাঁড়াবে 0। ফল হবে $M = \infty$। এ থেকে প্রমাণ হয় যে কোন স্থির ভর সম্পন্ন বস্তুর গতি যদি আলোর গতির সমান হয়, তবে ঐ গতিশীল অবস্থায় তার ভর হবে অসীম।

বিশ্বে বস্তু অসংখ্য। বস্তু একত্র করেই অসীমের ধারণা সম্ভব। সমগ্র বিশ্বই একমাত্র অসীম ভরসম্পন্ন হতে পারে। সুতরাং অসংখ্য বস্তুকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোর গতিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

∴ আলোর গতিই আমাদের জগতের সর্বোচ্চ গতি।

ট্যাকিওন কি ?—কিন্তু বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আলোর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন এক ধরনের কণার কথা বলছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেইনবার্গ এই কণাদের নাম দিলেন ট্যাকিওন। গ্রীক শব্দ 'ট্যাকি' কথাটির অর্থ হলো দ্রুত। ফোটন (আলোর গতি সম্পন্ন কণা)-এর তুলনায় দ্রুত গতি বোঝাতে ট্যাকিওন কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে জন্মের শুরু থেকেই এই কণারা আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। অর্থাৎ এরা প্রকৃতিগত ভাবেই আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। আমাদের পৃথিবীর জাড্যিক ধর্ম একরকম, এখানে আলোর গতিই সর্বোচ্চ হল গতির জগতে কিন্তু আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কণা ট্যাকিওনের জগতের জাড্যিক ধর্ম নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। তাই তাদের অস্তিত্ব থাকা একেবারে অসম্ভব নয়।

ইলেকট্রন ভর যখন $9{\cdot}1091 \times 10^{-28}$ গ্রাম, তখন ট্যাকিওনের ভর ধরা হয় তার 10^{14}ভাগের একভাগ। এক-দল বিজ্ঞানীদের অভিমত, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি মুহূর্তে ট্যাকি-ওনের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকেই ট্যাকিওন ও বিপরীত ট্যাকিওন বিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে পরস্পরকে ধ্বংস করার মধ্যে দিয়ে এবং বর্তমানে ব্রহ্মাণ্ডে কোন ট্যাকিওনের অস্তিত্ব সম্ভবত নেই।

শেরেনকভ বিকিরণ :—কিছু কিছু বস্তু আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। আলো জলের মধ্যে কম গতিবেগ নিয়ে চলে। তড়িতাধানযুক্ত পারমাণবিক কণারা জলের মধ্যে দিয়ে আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলার সময় আঘাতজনিত আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই আলো নীলাভ রঙযুক্ত। আলোর ক্ষেত্রেই নীলাভ আলোকে বলা হয় শেরেনকভ বিকিরণ। উচ্চশক্তি বিশিষ্ট কণাদের নিয়ে গবেষণা হয় যে সব গবেষণাগারে, সেখানে শেরেনকভ প্রক্রিয়াটি কাজে লাগানো হয় কণাদের সনাক্তকরণের জন্য।

ট্যাকিওনের অস্তিত্ব কি বাস্তবে থাকা সম্ভব ?—আইনস্টাইনের প্রমাণ অনুসারে, কোন বস্তুর ক্ষেত্রে আলোর গতি লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি দুটি বিষয়কে শর্ত হিসাবে ধরেছেন। প্রথমতঃ সেটি একটি বস্তু, তরঙ্গ নয়। দ্বিতীয়তঃ তার একটি স্থির ভর আছে। কিন্তু আলো যদিও কণার সমষ্টি, তথাপি আলোক কণিকা বা ফোটনের কোন স্থির ভর নেই। ফোটন স্থির হয়ে যাওয়ার অর্থই হলো তার ভর ও শক্তি অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ফোটন হিসাবে তার অস্তিত্বের অবসান। অতএব যে বস্তুর স্থির ভর আছে তার পক্ষে স্থির ভরহীন ফোটনের গতিলাভ করা সম্ভব নয়। তার মানে কোন বস্তুকে আলোর গতিতে নিয়ে গেলে তা আর বস্তু থাকবে না, শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু ট্যাকিওন তো প্রকৃতিগতভাবেই আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। অতএব অংকের ভাষায় এদের শক্তি ঋণাত্মক এবং স্থির ভর কাল্পনিক হবে। "ঋণাত্মক শক্তি" ব্যাপারটিকে বাস্তবে বোঝা সহজ নয়। তবে একথা বলা যায় যে, ঋণাত্মক শক্তির ধারণাটা সময় বা কালের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি করে। যদি ট্যাকিওনদের তড়িতাধান থাকে, তবে তারা শেরেনকভ রশ্মি নির্গত করবে এবং এর

সাহায্যে এদের চেনা যাবে। কিন্তু এই পথে ট্যাকিওনের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

আবার যদি ট্যাকিওন তড়িতাধান যুক্ত না হয়, তাহলেও তাদের অস্তিত্ব অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ পারমানবিক কণিকাদের সঙ্গে ট্যাকিওনের বিক্রিয়ার সময় সামগ্রিক শক্তির হেরফের নিশ্চয়ই হবে। ট্যাকিওনের সঙ্গে পারমানবিক কণিকাদের বিক্রিয়ার পর শক্তির পরিমাণ অবশ্যই বিক্রিয়ার আগের শক্তির মোট পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। এর কারণ হলো ট্যাকিওনের শক্তি ঋণাত্মক। কিন্তু এভাবেও ট্যাকিওনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায়নি।

আবার এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন তারকাপুঞ্জগুলি আলোর গতিতেই পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে যাচ্ছে।

বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ই. সি. জি. সুদর্শন ট্যাকিওনের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমানের জন্য দারুণ চেষ্টা করছেন। তিনি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহও। আবার বর্তমানের 'সুপারস্ট্রিং' থিয়োরীর দ্বারাও ট্যাকিওনের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ট্যাকিওনের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে : যদি কোন কণা আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে চলে, তা হলে তা স্পষ্টতই সময়ের বিপরীত দিকে যাবে। যেমন ধরা যাক,

বিতর্ক

আমরা জানি আলোর গতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল। আইনস্টাইনের প্রমাণ অনুসারে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে আলের গতি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি বলে স্বীকৃত। কিন্তু সম্প্রতি এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁরা আলোর চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি কণার কথা বলছেন। তার নাম ট্যাকিওন। যে ট্যাকিওনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলে—দূর মহাবিশ্বে রকেট চালানো হবে খুবই সহজ ব্যাপার। সত্যিই কি ট্যাকিওনের অস্তিত্ব রয়েছে ?

বাস্তবে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী বস্তু : ইউনাইটেড স্টেটসের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ওয়াই-এ হুইলার আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একজন বিশেষজ্ঞ। মি. হুইলার 'সুপার স্পেস' বা বাহির্মহাবিশ্বের একটি কাঠামো তৈরি করেন। এই বিশ্বে সময় এবং আলোর গতি, দুইএরই মান হারিয়ে যায়। এই বিশ্বে কোন মহাকাশযানকে কোন কালক্ষেপ না করেই যে কোন আকাঙ্ক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে। যেখানে আলো তার নিজস্ব গতি হারিয়ে ফেলে, সেখানে ট্যাকিওনের অস্তিত্ব নেহাতই কষ্টকল্পনা নয়।

আরেকটি উদাহরণ, ওয়াই-এস এ্যালেন এবং জে এগিওয়ানের নেতৃত্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বহুদিনের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বৃষ নক্ষত্রের অন্তর্গত কর্কট নীহারিকাটি সেকেণ্ডে 375000 মাইল গতিতে ছুটে চলেছে। এটা আলোর চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি গতিসম্পন্ন।

একটি বস্তু আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ নিয়ে দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সাধারণভাবে দর্শকের কাছে মনে হবে যে, বস্তুটি তার থেকে দূরে চলে যাবে। যাত্রা শেষে বস্তুটিকে দর্শকের কাছে মনে হবে, যখন অন্যপ্রান্ত থেকে বস্তুটির আগমন বার্তা জানিয়ে আলো আসার আগেই। অর্থাৎ দর্শক বস্তুটিকে চিনতে বা বুঝতে পারার আগেই।

আবার ধরা যাক, যদি কেউ গুলিবিদ্ধ হয়, তাহলে তত্ত্বগতভাবে সে সময়ের বিপরীত দিকে একটি সংকেত পাঠাতে পারে যা লোকটিকে গুলি ছুঁড়তে বারণ করবে এবং গুলিবিদ্ধ হতে দেবে না। ট্যাকিওনের আবিষ্কার সম্ভব হলে কার্য কারণ সম্বন্ধে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা এবং সময়ের স্বাভাবিক গতি সম্বন্ধে সকল ধারণা কেবলমাত্র সংকেতের সাহায্যে নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে। আবার কোন বিমান দুর্ঘটনায় পড়লে তা ট্যাকিওনের সাহায্যে একদিন আগে পৌঁছে গিয়ে দুর্ঘটনা এড়াবে। ট্যাকিওনের আবিষ্কার সম্ভব হলে দূর মহাবিশ্বে রকেট অভিযান চালানো সম্ভব হবে।

বিতর্ক বিভাগে পাঠক ও লেখকদের কাছ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য রচনা ও আলোচনা আহ্বান করা হচ্ছে—**সম্পাদক**

বসন্তের অগ্রদূত কোকিল

অজয় হোম

কোকিল বসন্তের অগ্রদূতই বটে। বসন্তের প্রারম্ভেই সেই প্রত্যূষ থেকে সন্ধ্যার শেষ পর্যন্ত বাতাস পূর্ণ থাকে এদের মুখর গানে। এক ঝাঁক কু-উ ডাক চলে এক পর্দা থেকে উঁচু পর্দায় যতক্ষণ না পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সপ্তম বা অষ্টম পর্যায়ে। তারপরই পাখিটা চুপ মেরে যায় কিন্তু অল্প পরেই আবার শুরু করে গোড়া থেকে।

মানুষের বিশ্বাস যে কেবল পুরুষই গান গায়। স্ত্রী-পাখি কেবল উচ্চৈস্বরে ‘কিক-কিক-কিক’ ডাক ছাড়ে যখন এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়। কোকিলের গান খুব সজীব এবং বসন্তকে যেন এগিয়ে নিয়ে আসে।

পাখিটা আকারে কাক, লেজ বেশ লম্বা এবং বেশ ছিমছাম শরীর। কোকিলকে দেখা যায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই। পুরুষের দেহ চকচকে কালো, হলদেটে, সবুজ চঞ্চু এবং লাল চোখ। স্ত্রী-পাখির দেহে প্রচুর ছিট ও সাদা লম্বা টান।

কোকিল পুরোপুরি বৃক্ষবাসী। কখনও মাটিতে নামে না। প্রধানত ফলভোজী, বট পাকুড় এবং অন্যান্য ছোটো ফল খুবই প্রিয়। পোকামাকড় বিশেষত শুঁয়োপোকা খুবই প্রিয়। মাঝে মাঝে অন্য পাখির ডিমও খেয়ে থাকে।

কোকিল কখনও নিজে বাসা বানায় না। সব সময়ে পরের বাসাতেই ডিম পেড়ে থাকে। কোকিলের প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট এবং সেই সময় এদের প্রধান গৃহস্বামী পাতি ও দাঁড়-কাকেদেরও সময়। এই সময়ে কোকিলরা খুবই ডাক বাজিয়ে দেয় এবং দেখা যায় কাক কোকিলকে তাড়া করে চলেছে।

যদিও লোকের বিশ্বাস কাক খুবই চালাক কিন্তু এই চালাকি সবই ব্যর্থ হয় কোকিলের বিরুদ্ধে। স্ত্রী-পুরুষ দুই কোকিলই একই সঙ্গে কাকের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে। পুরুষ কাকের বাসার কাছে গান শুরু করে, স্ত্রী সেই-সময় কাছেই লুকিয়ে থাকে। কাক জানে কোকিল তার চিরশত্রু তাই স্ত্রী-পুরুষ দুই কাকই নিজেদের বাসা ছেড়ে কোকিলকে তাড়া করে। যদিও কোকিল বেশ দ্রুত উড়তে পারে কিন্তু এই সময়ে ইচ্ছে করেই আস্তে উড়ে কাকদের তার বাসা থেকে দূরে নিয়ে যায়।

এই ফাঁকে স্ত্রী বা ছিট কোকিল তাড়াতাড়ি কাকের বাসায় উড়ে এসে ডিম পাড়ে। প্রায়ই দেখা যায় কাকের ডিমকে ফেলে দিয়ে সেখানে ডিম পাড়তে। কোকিলের ডিম কাকেরই মতো দেখতে তবে আকারে একটু ছোটো। দেখতে এত ছোট যে কাকের পক্ষে বোঝা শক্ত। কাক নিজের ডিম ভেবে তা দিতে শুরু করে। ডিম ফুটলে কাক নিজের বাচ্চা ভেবে লালনপালন করে। বাচ্চা অবস্থায় কোকিল পুরুষের মতো কালোই হয়। স্ত্রী-কোকিলের মতো হয় না। বসন্তের পরও ঐ বাসাতেই থাকে। একদম চুপচাপ থাকে বলে আমাদের চোখে পড়তেই চায় না।

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

লাল-নীল-সবুজ
তবলা-পিয়ানো-গীটার

কোন কোন ধাঁধার সমাধান ছক করে বুঝতে বা বোঝাতে সহজ হয়। ধরো তিনটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে মিলে ছ'বন্ধুতে খেতে গেছে রেস্টোর‍্যান্টে। ছোট ছোট টেবিল। দুজন করে বসার ব্যবস্থা। ওরা পাশাপাশি তিনটি টেবিলে বসেছে। মেয়েদের পোশাকের রঙ লাল, নীল আর সবুজ। ছেলেদের পোশাকের রঙও লাল, নীল সবুজ। লাল পোশাকের ছেলেটি পাশের টেবিলের সবুজ পোশাকে মেয়েকে বলল—'কি মজা, আমরা কেউ একই পোশাকের জুটি নই।' কে কোন পোশাকের রঙের সঙ্গে বসেছে? ছক করে বোঝা যাক।

একই রঙের জুটি নেই তাই তিন ঘর কেটে দাও

মেয়ে

ছেলে	লা	নী	স
লা	☒		
নী		☒	
স			☒

লাল ছেলের সঙ্গে সবুজ মেয়ে নেই সুতরাং...

মেয়ে

ছেলে	লা	নী	স
লা	☒	✓	☒
নী	☒	☒	✓
স	✓	☒	☒

ছক থেকে সহজেই বুঝতে পারছ কিভাবে জুটি বার করা হ'ল। এখন রঙের জুটি হ'ল লাল ছেলের সঙ্গে নীল মেয়ে (যেহেতু বলা হয়েছে লাল ছেলে পাশের টেবিলের সবুজ মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে তাই লালের সঙ্গে সবুজ হবে না), সবুজ ছেলের সঙ্গে লাল এবং নীলের সঙ্গে সবুজ।

এই জাতের আর একটা ধাঁধা নাও এবার।

পাপু, জগু আর গাবলু তিনজন বাজনা বাজায়। একজন গীটার, একজন তবলা আর একজন পিয়ানো। কে কী বাজায় সেটাই বলা হবে না। তোমাকে তা বার করতে হবে। শুধু সূত্র হিসাবে বলে দিচ্ছি যে তবলা বাজায় সে গীটারবাদককে ডাকতে গেল একদিন একটা রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে। গিয়ে দেখলো গীটারবাদক পিয়ানোবাদকের সঙ্গে অন্য শহরে বাজাতে গেছে। পিয়ানোবাদক তবলাবাদকের চেয়ে বেশি রোজগার করে। গাবলু জগুর চেয়ে কম রোজগার করে। গাবলু জগুকে চেনে না।

উত্তর আগামী সংখ্যায়।

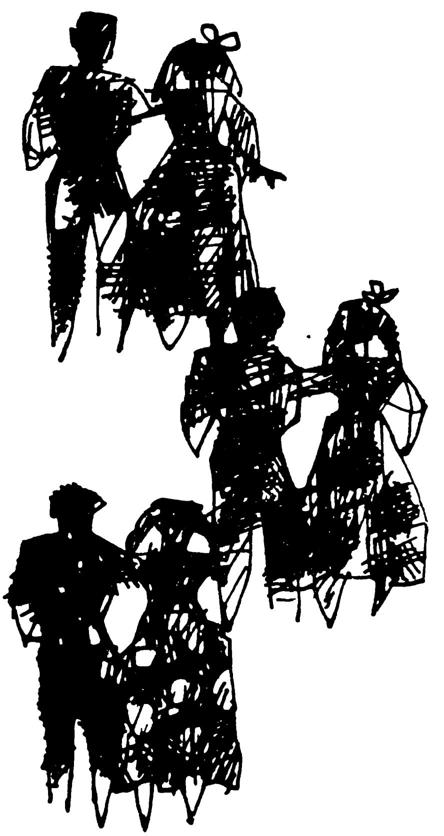

বুদ্ধিশুদ্ধি : চিড়িয়াখানায়-সার্কাসে-বাড়িতে-এর সমাধান

(1) 7টা হাতী 8টা ময়ূর। (2) 7টা ঘোড়া 11টা সওয়ার। (3) 4টে চারপেয়ে প্রাণী, 2টো দুপেয়ে আর 5টা সাপ।

ট্রেন টাইম

বুদ্ধিশুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

ঝিক ঝিক রেলের গাড়ি নিয়ে কবিতা, গল্প, কাহিনী আর ধাঁধা বানানোর শেষ নেই। আসলে ধাঁধা বানানোর মূলে মজা, আনন্দ আর অবাক হওয়ার একটা ব্যাপার থাকা চাই। ধাঁধা বানানোর গল্পে ট্রেন এসে পড়ে নানা কারণে। ট্রেন সম্পর্কিত নানা দিক পাওয়া যায় মজার মজার। ট্রেন লাইন, কামরা, খুঁটি-তার, ট্রেনের যাত্রী, নদী-নালা-ব্রীজ কত কী। মনে পড়ছে ট্রেনের ইলেকট্রিক ইঞ্জিন যখন শুরু হচ্ছে সেই সময় থেকে একটা ধাঁধা কানপচা হয়ে গেছিল। একটি ইলেকট্রিক ট্রেন দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘণ্টায় 100 কি. মি. বেগে ছুটে চলেছে। ট্রেনে ধোঁয়া কোন দিকে যাবে। ধাঁধাটা এখনো খুব ছোটদের বলা হয়ে থাকে। আর একটি বলি ট্রেন দিয়ে।

পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে রেললাইন। একটি মাত্র লাইন অর্থাৎ একসঙ্গে দুটি ট্রেন সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারে না। একদিন হঠাৎ ফুলস্পীডে একটা ট্রেন এদিক থেকে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে আর ওদিক থেকে আর একটা ট্রেন ফুল স্পীডে ঢুকে এদিকে বেরিয়ে এল কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো না। কিভাবে তা সম্ভব? সম্ভব। কারণ দুটি ট্রেন একই সঙ্গে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে প্রশ্নে তা বলা নেই। একটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আর একটি ঢুকলে অসুবিধার কিছু নেই।

ট্রেনের টাইম নিয়ে একটা ধাঁধা বলি। একটি ছেলে ট্রেন চড়তে ভালোবাসে। কাছাকাছি স্টেশন থেকে উত্তর দিকে তার মামার বাড়ি আর দক্ষিণ দিকে মাসির বাড়ি। ছেলেটির ট্রেন চড়ার ধরনটা মজার। যখন খেয়াল হবে (দিনের যে কোন সময়ে) তখনই সে ঘড়িটড়ি না দেখে স্টেশানে যাবে এবং যে ট্রেন প্রথমে পাবে তাতেই চাপবে। মামার বাড়ি যাওয়ার ট্রেন প্রতি একঘণ্টা অন্তর এবং মাসির বাড়ি যাওয়ার ট্রেনও প্রতি একঘণ্টা অন্তর আসে। ছেলেটি অনেকদিন নানা সময়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু একটা ব্যাপারে ও খুব অবাক হয়। প্রায় প্রতিবারই ও মামার বাড়ি যাওয়ার ট্রেনটা পায়। মাসির বাড়ি বলতে গেলে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। কেন এমন হয়? অথচ সব ট্রেনই কিন্তু ঠিক ঠিক টাইমে আসে।

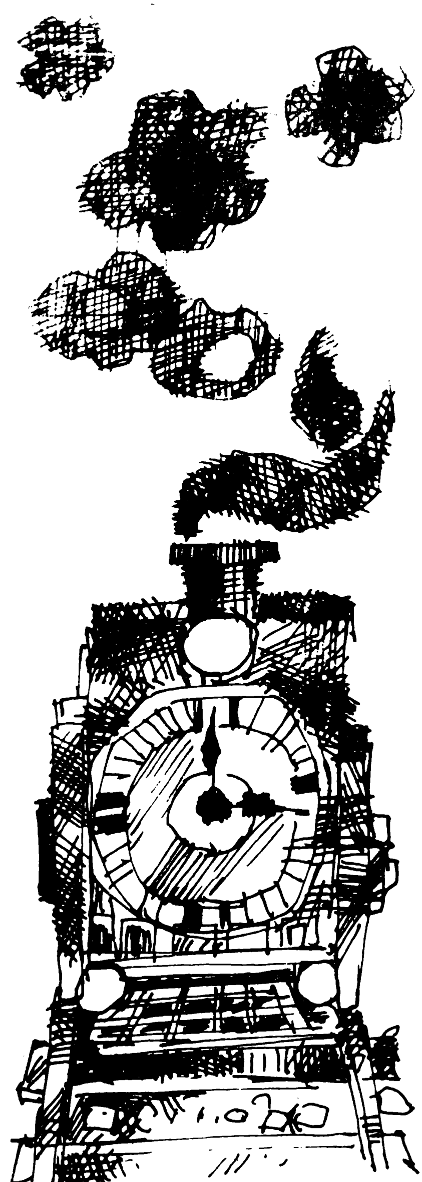

বুদ্ধিশুদ্ধি : তবলা-পিয়ানো-গীটারের উত্তর

পাপু গীটার বাজায়। জগু পিয়ানো বাজায়। তবলা বাজায় গাবলু।

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

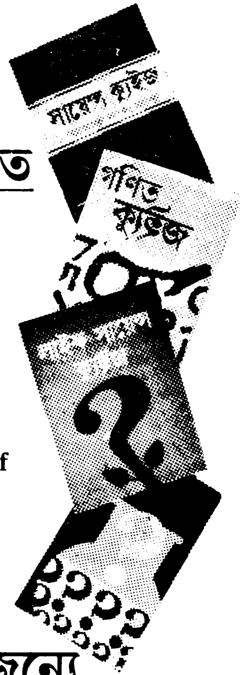

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

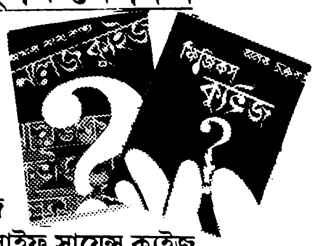

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

মডেল-এর রকমফের

নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র

বেশ কিছু দিন ধরে পাঠকবন্ধুদের দাবী ছিল যে 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে' এমন মডেল প্রকাশিত হোক যা কম খরচে করা এবং আইডিয়াগুলো হবে নতুন ও শিক্ষামূলক ধরনের। এখানে এই বিভাগে বেশ কয়েকটা মডেলের কথা তোমাদের বলব যেগুলো নতুন ধরনের তো হবেই তাছাড়া এদের বৈশিষ্ট্য হল একটি মাত্র মূল জিনিসের ওপর ভিত্তি করে সব মডেলগুলো তৈরি করা যাবে। এর ফলে একটি মাত্র জিনিসকে কতোভাবে ব্যবহার করে মডেল করা যায় সে সম্পর্কে তোমরা একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারবে।

এখানে আমরা প্রধান জিনিস হিসাবে CMOS IC-CD4011AE কে বেছে নিয়েছি, এই আই.-সির মধ্যে চারটি NAND GATE আছে। NAND Gate-এর input অনুসারে কিভাবে out put পরিবর্তিত হয় তা টেবলের মাধ্যমে Fig-1-এ দেখালাম, Fig-1-এর নীচের দিকে NAND Gate-এর Schematic symbol দেখালাম। সার্কিটে আমরা ওই চিহ্নটাই ব্যবহার করব। লক্ষ্য করলে দেখবে একটা NAND Gate-এর মোট তিনটে পয়েন্ট রয়েছে, এর মধ্যে যে দুটো একদিকে রয়েছে ঐ দুটো হল input এবং অন্যটি output। এখানে একটি Gate-এর দুটি input আছে বলে একে অনেক সময় 2-input NAND Gate বলে উল্লেখ করা হয়। এবার Gate চারটি কিভাবে একটা IC-এর ভেতরে থাকে Fig-2 তে সেটা দেখালাম! ভবিষ্যতে আমরা সার্কিটে শুধুমাত্র Gate-এর symbol-টাই এঁকে দেখাব, তখন এই pin Configuration দেখে IC লাগাতে হবে।

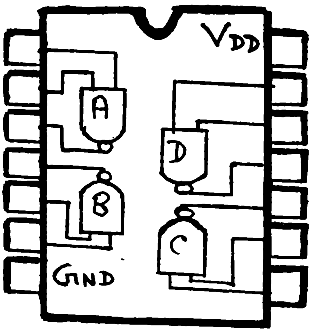

CD 4011 AE.

A	B		Y
0	0		1
0	1		1
1	0		1
1	1		0

TRUTH TABLE

এবারে Fig-1-এর Truth table-এর সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে? তোমরা শুনেছ যে digital electronics বা Computer-এ-'O' এবং '1' এই দুটিসংখ্যা ব্যবহৃত হয়। কোন পয়েন্টের বিভব (Potential) low থাকলে তাকে 'O' এবং potential high থাকলে তাকে '1' বলে ধরা

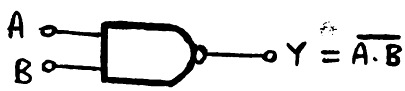

হয়। এখন NAND Gate-এর input-এ High বা low দিলে output-কি হবে Table-এর সাহায্যে সেটাই দেখানো হয়েছে। যেমন একেবারে নীচের লাইনটার মানে হল কোন NAND Gate-এর দুটি input High হলে output low হবে। এখন NAND Gate-এর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন মডেল তৈরি করব।

গ্রাম+পোস্ট-চামরাইল, হাওড়া-711323।

মডেল বানাতে গিয়ে / রাজেশ গিরি

সেদিন সকালে পড়ার ঘরে আছি, এমন সময় দেখি পাড়ার বুম্বা হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলো পড়ার ঘরে, হাতে তার এপ্রিল '87-এর কিঃ জ্ঞাঃ বিঃ। ঘরে ঢুকেই সে বলল, "আচ্ছা এটা কি সার্কিট দিয়েছো বলত! এটা পড়ে তো খুব আনন্দিত হয়ে ছিলাম কিন্তু ডায়াগ্রামটা দেখে আমার সব আনন্দ চলে গেছে, এই ডায়াগ্রামটা কি আজে বাজে এঁকেছো, যে বুঝতেই পারছিনা তো বানাবো কি করে? বইটা খুলে 'চোর তাড়ুয়ার' সার্কিট ডায়াগ্রামটা বের করে দেখায় সে।

ওর কথা থেকে বুঝলাম অনেক কিছুই বুঝতে ওর অসুবিধা হয়েছে। এই মডেল বানাতে গিয়ে আর যারা বুম্বার মত অসুবিধায় পড়েছো তাদের কথা চিন্তা করেই এই লেখা লিখছি। এই লেখা থেকে শুধু যে 'চোর তাড়ুয়া'-কে বুঝতে সুবিধা হবে তা নয়। এই যন্ত্র যে সব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি, সেই সব যন্ত্রাংশ দ্বারা নির্মিত অন্যান্য মডেল বানাতে গিয়ে আর কোন অসুবিধা হবে না নির্মাতাদের।

প্রথমেই দেখলাম সার্কিটে উল্লিখিত (T) এবং এর সঙ্গে যুক্ত তারের উপরে ও নিচে অঙ্কিত ডট্ লাইন-এর অর্থ বুঝতে পারেনি বুম্বা। এই সার্কিটের বিবরণে আমি লিখেছি যে, IC-555-এর ট্রিগার (Trigre) টার্মিনাল থেকে একটা তার তালায় লাগাতে হবে, ঐ (T) দ্বারা আমি স্পর্শ (Tuch) অংশ অর্থাৎ তালাকে বুঝাতে চেয়েছি। এই ট্রিগার টার্মিনাল জিনিসটা বোঝাতে গেলে IC-555-এর সম্বন্ধে দু এক কথা বলতে হবে। পরের সংখ্যায় আমি এনিয়ে লিখবো। ওর পরের অসুবিধাটা হল ঐ ডট লাইন নিয়ে। ওটা হচ্ছে একটা Two in one তার যার মধ্যে মাঝখানে আছে একটা তার এবং ঐ তারটার চারদিকে ওকে স্পর্শ না করে জালের আকারে জড়িয়ে আছে আর একটা তার। প্রথমোক্ত তারটি হল ট্রিগার পয়েন্ট থেকে তীর চিহ্ন অর্থাৎ তালা পর্যন্ত টানা সোজা লাইনটা আর দ্বিতীয়োক্ত তারটা হল ঐ ডট লাইন নির্দেশিত লাইনগুলো। এই তারকে স্ক্রীন তার বা শিলভেড তার বলা হয়। ট্রিগার পয়েন্ট থেকে তালা পর্যন্ত লম্বা তারটিকে এই সার্কিটে ঋণাত্মক তড়িতে আহিত ঐ ডট লাইন নির্দেশিত তারটি প্রহরীর মত ঘিরে রেখেছে যাতে বাইরের থেকে কোন তরঙ্গ বা অন্য কিছু ওর কোন ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। এর ফলে ট্রিগারটি আপনা থেকে অন্ হতে পারে না।

বুম্বার আর একটা অসুবিধা হল, সে সার্কিটে অঙ্কিত IC-টার কোন পিনটার নম্বর কত তা বুঝতে পারেনি। এই

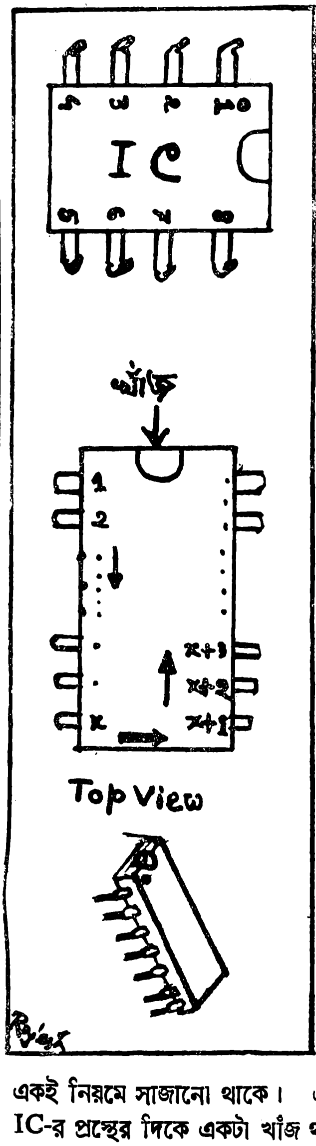

সার্কিটে অঙ্কিত IC-টা প্রকৃত IC-টারই চিত্ররূপ, এটা বোঝা যাচ্ছে ওর সামনে অঙ্কিত খাঁজটা থেকে [এপ্রিল-87 নিজে নিজে কর দ্রষ্টব্য] ফলে একটা প্রকৃত IC-তে যেভাবে পিন গুলো সাজানো থাকে এখানেও ঐ ভাবে সাজানো আছে। সাধারণতঃ সার্কিট ডায়াগ্রামে এইরূপ না এঁকে IC-র ডায়াগ্রাম-টিকে ছবি অর্থাৎ অঙ্কনের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পিনের অবস্থান আঁকা হয়। কিন্তু এখানে এইরূপ আঁকার কারণ হল সার্কিট দেখে —তাকে আবার বোর্ডে বানাবার মত করে এঁকে নেওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না নির্মাতাদের। একেবারে এই সার্কিট দেখেই ভেরো বোর্ডে বানিয়ে ফেলা যাবে। যে কোন IC-তে পিনের নম্বর একই নিয়মে সাজানো থাকে। এই নিয়মটা হল—যেকোন IC-র প্রস্থের দিকে একটা খাঁজ থাকে এই খাজটাকে উপরের দিকে রাখলে বাঁদিকের পিনগুলোর সবথেকে উপরের পিন থেকে নিচের দিকের পিনগুলো 1 থেকে পর পর নম্বরের। বাঁ দিকের সব থেকে নিচের পিনের পরবর্তী নম্বরের পিনটা থাকে ডানদিকের সবথেকে নিচে এবং এর উপর দিকে পর পর পরবর্তী নম্বরের পিনগুলো অবস্থান করে।

ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর-721 507

বৈদ্যুতিক বাতি ও তার ব্যবহার

সমীরকুমার ঘোষ

বৈদ্যুতিক বাতি বা Electric bulb আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আজ প্রায় অপরিহার্য। এই বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবন ও তার ধর্ম সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করব।

যখনই কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হয়, তখনই তার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের বিভিন্ন ফল দেখতে পাওয়া যায়, এরই একটির নাম তাপীয় ফল বা Thermal effect। পরিষ্কার ভাবে এর অর্থ হল এই যে, যখন কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হয়, তখনই তারটি গরম হয়ে ওঠে। তারটির উষ্ণতার পরিমাণ অবশ্য নির্ভর করে বিভিন্ন ভৌতিক রাশির মানের উপর। যাইহোক, বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলামাত্র তারটি গরম হবেই এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তারের উষ্ণতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তার থেকে আলোর সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের তাপীয় ফলের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা আলো উৎপাদনের উপাদানকেই আমরা বলি বৈদ্যুতিক বাতি। সাধারণ একটা বৈদ্যুদিক বাতি বলতে আমরা বুঝি, বায়ুশূন্য একটি কাচের গোলকের ভেতর খুব সরু একটি তার লাগানো—যাকে বলা হয় 'ফিলামেণ্ট' (filament)। এই সরু তারটির মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ চালিত হয়, তখন তারটি স্বভাবতঃই গরম হয়ে ওঠে এবং উত্তপ্ত এই তার থেকেই আলোর সৃষ্টি হয়। এইভাবে উৎপন্ন আলোর রং বা প্রকৃতি নির্ভর করে, তারটি কি পরিমাণ উত্তপ্ত হয়—তার উপর তারটির উষ্ণতা যখন 550° সেণ্টিগ্রেডের মত, তখন খুব হালকা লাল রঙের আলো সৃষ্টি হয়; 1000° সেণ্টিগ্রেডে, চেরী ফলের মত গভীর লাল রঙের আলো, 1300° সেণ্টিগ্রেডে ফিকে সাদা আলো ও 2000° সেণ্টিগ্রেডে জোরালো সাদা আলো উৎপন্ন হয়। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, কোন বৈদ্যুতিক বাতি যখন আলো দেয়, তখন তার ভেতরের উত্তাপ কমপক্ষে প্রায় 2000° সেণ্টিগ্রেড মত থাকে। স্বভাবতঃই বাতির ভেতরে যে সরু তারটি থাকে, সেটি এমন এক পদার্থের দ্বারা তৈরী হওয়া প্রয়োজন, যা এই প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে পারে।

ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হলেই, ফিলামেণ্টটি যথারীতি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এর গাত্রদেশ থেকে তাপ বিকিরণ সুরু হয়, যার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভাবে তাপ বিকিরণের সময়ে যদি ফিলামেণ্টের চারদিকে বাতাস থাকে, তাহলে ঐ প্রচণ্ড উত্তাপে ফিলামেণ্টটি বাতাসের সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়, সেজন্য বৈদ্যুতিক বাতি তৈরীর প্রথম পদক্ষেপেই কাচের গোলকটিকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা প্রয়োজন।

বিদ্যুতের সাহায্যে আলো উৎপাদনের প্রথম প্রচেষ্টা হয় 1810 সালে। যখন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হামফ্রী ডেভী (Davy) দুটি কার্বন দণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক আর্কের (arc) সৃষ্টি করে আলো উৎপন্ন করেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এভাবে আলো সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমতঃ, এভাবে আলো উৎপাদনে বিদ্যুতের প্রয়োজন হ'ত অনেক বেশি। দ্বিতীয়তঃ, এক নাগাড়ে এভাবে উৎপন্ন আলোর ব্যবহারে অসুবিধাও দেখা দিল। সেজন্য ডেভীর আর্ক-বাতির ব্যবহারিক প্রয়োগ খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। এরপর 1877 সালে জ্যাবলোকফ্ নামে এক বিজ্ঞানী কিছুটা উন্নত ধরনের একরকম আর্ক-বাতির উদ্ভাবন করেন। তাঁর সেই বাতিটি যদিও ডেভীর বাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের হল, তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই অসুবিধা বলতে গেলে প্রায় একই রকমের রয়ে গেল। এর ফলে আর্ক-বাতির সাফল্য বিশেষ ভাবে তখনকার মত বিঘ্নিত হল।

আর্ক-বাতির নানারকম অসুবিধার ফলেই ফিলামেণ্ট বাতির দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই ধরনের বাতি তৈরীর প্রথম প্রচেষ্টা হয় 1840 সালে, যখন Grove ও Mollins নামে দুই বিজ্ঞানী টাংস্টেনের তৈরি একটি সরু তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দেখতে পান যে, তার থেকে আলো উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ঐ তারটি বাতাসের সংস্পর্শে থাকায়, টাংস্টেন বাষ্পীভূত হয়ে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যেতে থাকে। এই অসুবিধা দূর করেন 1845 সালে। Star ও King নামে দুই বিজ্ঞানী। তাঁরা টাংস্টেন ফিলামেণ্টকে একটি বায়ুশূন্য গোলকের মধ্যে রেখে তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে সফলভাবে ফিলামেণ্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করেন 1880 সালে আমেরিকার

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী Edison এবং একই সময়ে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Swan। এ জন্যই এই ধরনের ফিলামেণ্ট বাতিকে বলা হয় Ediswan বাতি। এঁদের বাতিতে ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত সরু কার্বনের তার। কিন্তু এই ধরনের কার্বন ফিলামেণ্টের অসুবিধা ছিল অনেক। প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে থাকে, যার ফলে সূক্ষ্ম কার্বনের গুঁড়া কাচের গোলকের গায়ে জমা হয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করে দিতে থাকে, তাছাড়া, কার্বন বাষ্পীভূত হয় 1800° সেণ্টিগ্রেডে অথচ বেশ সাদা আলো পেতে হলে উষ্ণতার প্রয়োজন হয় কমপক্ষে 2000° সেণ্টিগ্রেড, সেজন্য কার্বন ফিলামেণ্টের অসুবিধা দূর করে তার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন যথাক্রমে 1897 সালে বৈজ্ঞানিক Nernst. 1900 সালে বৈজ্ঞানিক Welsbach, 1905 সালে বৈজ্ঞানিক Botton এবং সবশেষে 1909 সালে বৈজ্ঞানিক Coolidge। এই কুলিজের তৈরি ফিলামেণ্টের প্রচলনই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এই ফিলামেণ্টটি তৈরি হয়েছিল Wolframite নামে টাংস্টেন, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের এক মিশ্রণ থেকে।

বৈদ্যুতিক বাতির কাচের গোলকটিকে বায়ুশূন্য করার ফলে তাপ পরিবাহিত কম হয় একথা ঠিক, কিন্তু ফিলামেণ্ট ক্রমশঃ বাষ্পীভূত হয়ে কাচের গোলকের মধ্যে পাতলা আবরণ সৃষ্টি করায় বাতির ঔজ্জ্বল্য কমে আসত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য, আধুনিক বিজলী বাতিতে কাচের গোলকটিকে বায়ুশূন্য না রেখে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আর্গন বা নাইট্রোজেন) ভর্তি করে দেওয়া হয়। এর ফলে ফিলামেণ্ট থেকে কিছু পরিমাণে তাপ পরিবাহিত হয় বটে, তবে এই ব্যবস্থায় বাতির ঔজ্জ্বল্য অনেক বাড়ে। অবশ্য এভাবে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ কমাবার জন্য 1913 সালে বৈজ্ঞানিক Langmuir এক উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি ফিলামেণ্টের তারটিকে সোজা অবস্থায় না রেখে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রাখেন—যাকে বলা হয় coiled coil। এই ব্যবস্থায় পরিবাহিত তাপের পরিমাণ অনেক কমে গিয়ে বাতির ঔজ্জ্বল্য অনেক বাড়ে। আধুনিক যুগে প্রায় সমস্ত ইলেকট্রিক বাল্বেই এই coiled coil প্রথার প্রচলন থাকে।

আর্গন বা নাইট্রোজেন জাতীয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি বাতি, যা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। সাধারণতঃ প্রায় 1000 ঘণ্টা আয়ুষ্কালসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ এই ধরনের ফিলামেণ্ট বাতি 1000 ঘণ্টার বেশি আলো দিতে পারে না। কিন্তু বাতির আয়ু আরো বাড়াবার জন্য ইদানীং যুগে ফ্লুরোসেণ্ট (fluorscent) বাতি নামে এক ধরনের বাতির প্রচলন হয়েছে, যা প্রায় ব্যাপকভাবে সব ঘরেই ব্যবহৃত হচ্ছে, চলতি ভাষায় এই ধরনের বাতিকে Tube light বলা হয়। এই ধরনের বাতিতে একটি লম্বা কাচের নলের মধ্যে কিছু পারদ ভর্তি করে তার দুই মুখ বন্ধ করে, দুইটি তড়িৎদ্বার (electrode) দুই মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন এই তড়িৎদ্বার দুটির সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সংযোগ ঘটানো হয়, তখন বাতিটির ভিতরকার পারদ-বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ সুরু হয় এবং তার ফলে আলো উৎপন্ন হয়। কাচের নলের ভেতরকার দেওয়ালে এক ধরনের ফ্লুরোসেণ্ট রঙের প্রলেপ দিয়ে, নানা বর্ণের আলো উৎপন্ন করা যায়। এই ধরনের বাতির সুবিধা হল—এই বাতি থেকে যে আলো উৎপন্ন হয়, তা ছায়া সৃষ্টি করে না বললেই চলে, চোখে ধাঁধাঁর (glare) সৃষ্টি করে না এবং বাতি গরমও হয় খুব কম, অথচ এই ধরনের বাতি থেকে যে আলো উৎপন্ন হয় তার ঔজ্জ্বল্য সাধারণ একটা ফিলামেণ্ট বাতি থেকে নির্গত আলোর প্রায় তিনগুণ। এছাড়া একটি ফ্লুরোসেণ্ট বাতির আয়ুষ্কালও প্রায় 3000 ঘণ্টা। এজন্য আজকাল বাড়ি, ফ্যাক্টরী, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি সর্বত্র এই বাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই বাতির কাচের নলটিকে বাঁকিয়ে নানা আকৃতি বা আকার দেওয়া সম্ভব বলে, আলোকসজ্জার ব্যাপারেও এই বাতির যথেষ্ট সমাদর রয়েছে।

এই হল বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবনের কথা ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে দু'চার কথা।

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

গোপলচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার আট টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ভারতীয় যাদুঘরের 175 বছর

কিন্নর রায়

গোড়াপত্তন

ভারতীয় যাদুঘরের একশো পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হলো 1989-এর 2 ফেব্রুয়ারি।

1814 সালের 2 ফেব্রুয়ারি পাকাপাকি ভাবে কলকাতাতে তৈরি হলো যাদুঘর। সে এক ইতিহাসই বটে।

1796 সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রথম ঠিক করেছিল কলকাতাতে তৈরি হবে যাদুঘর। এশিয়াটিক সোসাইটির মিটিং বসে সুপ্রিম কোর্টের বাড়িতে। তাদের নিজেদের তখনও কোনো বাড়ি নেই। এশিয়াটিক সোসাইটির যে

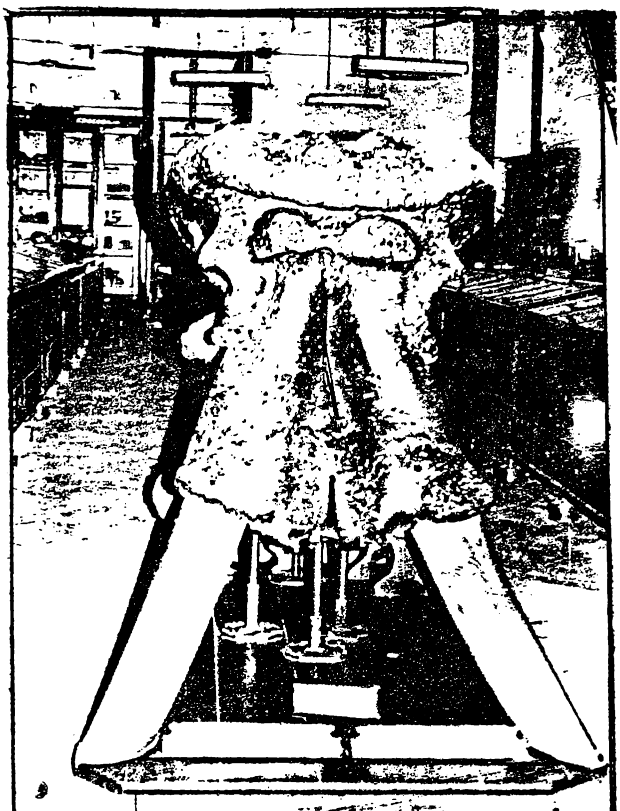

বিদ্বজ্জনেরা, তাদের ভারি ইচ্ছা হলো তৈরি করা হোক একটা মিউজিয়াম এই কলকাতাতে। সঙ্গে একটা লাইব্রেরি।

কলকাতা তখনও কলকাতায় পৌঁছয়নি। পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়েছে ঊনচল্লিশ বছর আসে। গোটা চৌরঙ্গীতে তখন দুখানা মাত্র বাড়ি। চৌরঙ্গীর সামনে জঙ্গলে বাঘ, বুনো শুয়োর। ওয়ারেন হেস্টিংস হাতি শিকার করতে এসেছিলেন এখানে।

সুপ্রিম কোর্টের বাড়িতে বসে এশিয়াটিক সোসাইটির লোকেদের আলোচনা, কাজকর্ম করতে আর কতদিন ভালো লাগে! সাহিত্য-বিজ্ঞানচর্চা কি এই পরিবেশে হয় নাকি! তাই পার্ক স্ট্রিটে চৌরঙ্গীর কোণে একটি আস্তাবলকে সরিয়ে আস্তে আস্তে তৈরি হলো এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ি। সেটা 1808।

ঐ সময় কোপেনহেগেন থেকে এক সার্জন বন্দী হয়ে এলেন কলকাতায়। তাঁর নাম ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ। ডেন মার্কের এই মানুষটি ইংরেজদের হাতে আটকা পড়েছেন। তখন ডেন মার্কের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল বৃটেনের।

ন্যাথানিয়েলের নেশা ছিল নানা ধরনের উদ্ভিদ সংগ্রহের। নিজে ডাক্তার। সংগ্রহ করেন নানান গাছ গাছালি। স্বপ্ন দেখেন একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলার। আগের বছর দেশ ছেড়ে বন্দী হয়ে আসার সময় দেখেছেন ন্যাশনাল ম্যুজিও গড়া হয়েছে নিজের দেশে।

শ্রীরামপুরে বন্দী থাকা ওয়ালিচ চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে। সেই চিঠিতে দেখানো ছিল একটি মিউজিয়ামের স্বপ্ন। চিঠি পাওয়ার পরই 1814 সালের 2 ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটি ঠিক করল তৈরি করা হোক যাদুঘর। যাদুঘর বসুক একতলার ঘরে, দোতলায় লাইব্রেরি।

সেই যে মিউজিয়াম তৈরি হলো, তখনই তার আর একটা নাম হলো মড়া সোসাইটি।

বাড় বাড়ন্ত

1814 সালে যখন মিউজিয়াম তৈরি হলো কলকাতায়, তখন লোহার ঘোড়া স্টিম ইঞ্জিন ঘস ঘস শব্দ তুলতে তুলতে, ভোঁ বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে ইউরোপে। কলকাতায় এসে হাজির হলেন প্রথম বিশপ। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খাবার জল

আনা হলো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পারে। ঐ বছরই ব্রাহ্ম ধর্মের বার্তা নিয়ে কলকাতায় এলেন রামমোহন রায়। ঠিক করলেন পাকাপাকিভাবে থাকবেন কলকাতাতেই। সবে গড়ে উঠেছে টাউন হল,, চৌরঙ্গীতে বসেছে নতুন থিয়েটার।

যাদুঘরের ঘর বাড়ি ভর্তি করার জন্যে হৈ-হৈ করে জমা পড়তে লাগল। প্রাচীন নানা মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, উল্কাপিণ্ড, মুদ্রা, আদিবাসী মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র দিয়ে যেতে লাগলেন সেদিনের দাতারা।

গোড়ার দিকে সাহেবরাই ছিলেন বেশিরভাগ দাতা। এঁদের কেউ ডাক্তার, কেউ শিল্পী, কেউ সেনাবাহিনীর মেজর, কেউ বা ইংরেজ গভর্নর আর নয়তো তাঁদের বৌ মেয়ে। যাদুঘরের প্রথম কিউরেটর হয়েছেন ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ। তিনি দিয়েছেন বেয়াল্লিশ রকমের জিনিস।

তখনকার বাঙালিরা যাদুঘরকে ডাকতেন 'কৌতুকাগার' নামে। কৌতুকাগার হলো 'হাউস অব কিউরিওসিটিজ'-এর বাংলা। চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ বইতে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন, 'ছোটরা কেউ যদি সেই বিশাল কূর্মটি দেখতে চায় তবে যেন 'ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে' গিয়ে দেখে আসে। তাছাড়া মমি করা এক মানুষকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—'আজ তুমি কাচপাত্রে কৌতুকাগারে।' সেই মমির কথা পরে।

একশো চুয়াত্তর রকমের রকমারি জিনিসপত্র জমা পড়ল দু বছরের মধ্যে। দাতাদের মধ্যে ছিলেন সেই বিখ্যাত সাহেব উইলিয়াম কেরিও। ছ জন মহিলা—সকলেই মেমসাহেব, দান করেছেন কিছু কিছু জিনিস।

প্রথম দিকের ছ জন ভারতীয় দাতার মধ্যে পাঁচজনই বাঙালি। অন্যজন এক মহিলা, বেগম্ সমরু। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান বাবু রামকমল সেনের। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ঠাকুর্দা। খুব সামান্য অবস্থা থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছিলেন উনি। হয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সেক্রেটারি। তিনি দিলেন কিছু চড়ক পুজোয় ব্যবহার করা জিনিসপত্র আর কয়েকটি বাজনা। দিয়েছিলেন বঁড়শি কাঁটা আর একটি শুঁটকি মাছ।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব দিয়েছিলেন একটি পায়রা। তার নাকি আবার দুটো মাথা। এর মধ্যে যাদুঘরে জমা পড়ল বোধিসত্ত্ব পদ্মপানিনির একটি মূর্তি।

দিন মাস বছর যায়।

পার্কস্ট্রিটের যাদুঘর বাড়ির সামনের মাঠে ভেড়া চরায় রাখাল। ছাতায় মাথা ঢেকে হেঁটে যায় মানুষ। কলস কাঠি পাঁচিলের গায়ে রাস্তার ওপর দৌড়ায় জুড়ি গাড়ি। হাড়গিলেরা ময়দানে বসে বসে হাড় মাস চেখে চেখে দেখে।

1848 সালে কলকাতায় ধরা পড়ল কুমীর। যাদুঘরের দোতলায় উঠে দেখা যাবে কাঠের পাটাতনের নকল নদীতে যে দুটো বিশাল কুমীর নিজেরাই যেন কাঠ হয়ে আছে, তাদের একটা সেই কলকাতার কুমীর। ওড়িশার সমুদ্র-উপকূল থেকে ধরে কুমীরের কঙ্কাল সাজানো আছে কাচের শো কেসে। তার পাশে সাজানো ভারি ভারি পায়েল, আংটি, বালা, মল—সব মিলিয়ে ওজন পনের পাউণ্ড। কত মানুষ যে গয়না সমেত পেটে গেছিল কুমীরটার।

কাঠের কফিন বন্দী মমি আছে যাদুঘরে। চিত্র-বিচিত্র লিনেন কাপড়ে জড়ানো তার শরীর। মমির মুখের মাংস গেছে খসে। পাশের কফিনের ঢাকনায় আঁকা আছে তার মুখ। চিবুকে একটু লম্বা দাড়ি।

এখনও অব্দি ঠিক ঠিক কেউ বলতে পারে না কবে এসেছিল মমি এই যাদুঘরে। শুধু এটুকুই জানতে পারা গেছে 1834 সালে ই. সি. আর্চবোল্ড নামে এক ইংরেজ লেফটেন্যান্ট মিশরের সোর্বায় রাজার সমাধি থেকে মমিটি আনলেন মোকা বন্দরে। সেখান থেকে একটি যুদ্ধ জাহাজ আসছিল ভারতে। তাতেই চাপিয়ে দেওয়া হলো মমিকে।

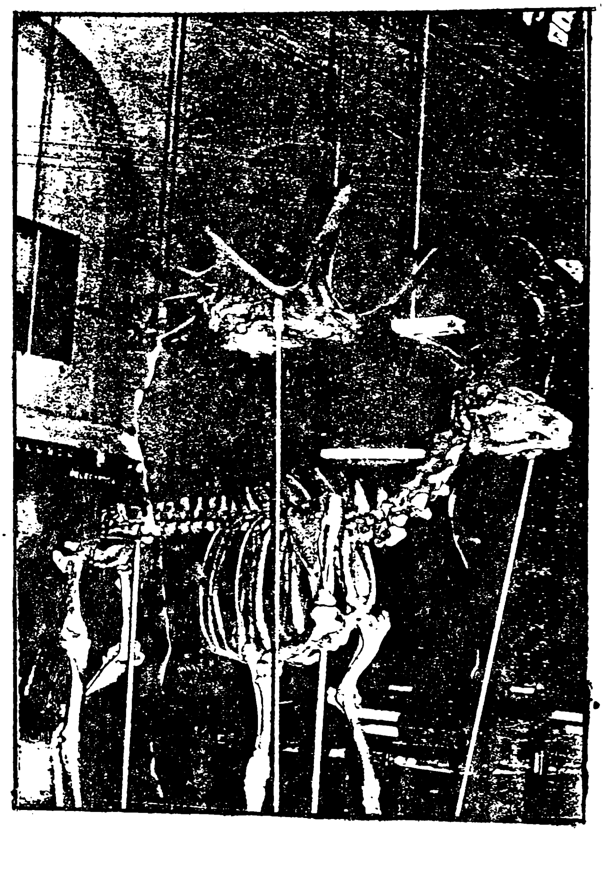

জাহাজের মুসলমান নাবিকেরা আপত্তি করেছিল—মরা মানুষের শরীর তারা নিয়ে যেতে পারবে না সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

কিন্তু মমি এলোই শেষ পর্যন্ত। 1833 সালের একটি লেখায় দেখা যাচ্ছে, মমি তখন যাদু ঘরে। নানান গল্প, কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে এই মমিকে ঘিরে। এমনও শোনা যায়, মমি আনতে আনতে শান্ত সমুদ্র নাকি হঠাৎ হয়ে ওঠে উত্তাল। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। সামুদ্রিক ঝড়। উথাল-পাতাল সাগর। মাঝি-মাল্লারা ভূত জিনের ভয় পেতে থাকে। যেমনটি হয়ে থাকে কুসংস্কার ঢাকা মনে। শেষ অব্দি সুয়েজ খাল, আরব সাগর হয়ে বোম্বাই বন্দরে এসে নামল মমি। তারপর কলকাতায়।

1980 সালে এক্স-রে করা হয়েছিল এই মমির। এমনটি বিদেশে হয়েছে অনেক আগে। কোন রোগে মারা গেছিল মানুষটি, তা জানতেই এই এক্স-রে। রিপোর্ট থেকে জানা গেছিল মমিটি একজন বয়স্ক পুরুষের। মৃত্যুর সময় তার বয়েস ছিল পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। হাঁটুতে ছিল গেঁটে বাত। জানু বুক আর পিঠের ভাঙা হাড় দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন, তাঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল কোনো ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে।

কে খুন করেছিল এই মানুষটিকে? তবে কি সে ছিল ফারাওয়ের কোনো প্রিয় পরিচারক। যাকে ফারাওয়ের মৃত্যুর পর পিটিয়ে মেরে ফেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল ফারাওয়েরই পিরামিডে?

1878 সালের 1 এপ্রিল চৌরঙ্গীতে যাদুঘরের দরজা খুলে দেয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যাদুঘরের প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট জন অ্যানডারসন। 1847 সালে যাদুঘরের আশে পাশে ঘুরে বেড়াত যে কালো শকুনটা তাকে স্টাফ করে রাখা হলো কাচের শো কেসে—এই যাদুঘরেই। রাখা হলো ডিম সমেত আফ্রিকার উটপাখি। আর, আরও কত কত পাখিরা!

কানিংহাম সাহেব 1873 সালে উদ্ধার করে এনেছিলেন লাল পাথরে তৈরি ভারহুত তোরণের কিছু অংশ। গোরুর গাড়ি, ট্রেন, ট্রাকে সেই পাথরখণ্ড এলো কলকাতায়। তারপর আর কত কত জিনিস।

যাদুঘরের ভি. আই. পি. দর্শক

রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন যাদুঘরে। তিনি একবার তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, আমি একবার মিউজিয়মে। তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গিয়েছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি। তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।'

কথাগুলো তিনি বলেছিলেন 1884 সালে। ততদিনে যাদুঘর এখনকার বাড়িতে উঠে এসেছে। আসতেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বোস পাড়ার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ঘুরে ঘুরে ছাত্রীদের দেখাতেন পুরনো মূর্তি, ছবি। তারপর সম্রাট অশোকের সময়কার মূর্তি স্তম্ভ ইত্যাদি। দেখার পর বসে যেতেন পাথরের তৈরি গাছ কল্পবৃক্ষের সামনে। মেয়েদের বলতেন, এই কল্পবৃক্ষের সামনে ধ্যান করলে ইচ্ছে পূরণ হয়। সেই কল্পবৃক্ষ এখনও আছে যাদুঘরে।

1874 সালের জানুয়ারি মাসে সে যুগের বিখ্যাত হিন্দি ভাষার লেখক ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। বিদ্যাসাগর মশাই যাদুঘরে ঢুকতে পারেন নি। কারণ তাঁর পরনে ছিল ধুতি-চাদর আর তালতলার চটি।

শেষকথা

যাদুঘর এখন তার চার দেয়াল পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মানুষের মাঝখানে। গ্রামে-গঞ্জে গাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে ভ্রাম্যমাণ যাদুঘরকে।

যাদুঘরের এখনকার ডিরেক্টর ডক্টর রমেশচন্দ্র শর্মা। এডুকেশন অফিসার শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। শ্যামলবাবু আমাদের জানালেন, ভারতীয় যাদুঘরের মুদ্রা বিভাগ, কলা-বিভাগ, তত্ত্ববিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ বিভাগ এবং প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে আছে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। যাদুঘরের 6টি বিভাগে 45টি গ্যালারি। ভারহুত ভাস্কর্য, হরপ্পা মহেঞ্জদারো যুগের শিলমোহর, সাঁচীর যক্ষী, মানভূমের মহিষমর্দিনী, শাহজাহানের পানপাত্র, মিশর-মেসোপটেমিয়ার পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ, বালুচর শাড়ি, চম্বার রুমাল, ফুলকারি নকশা, জাহাঙ্গীরের রাশিমুদ্রা, নানান গ্রামীণ পোশাক-আশাক, শিরোভূষণ ওঙ্গী, খাসী, রিয়াং, বিরহোড়, সাঁওতাল, উরালী—আরও সব নানান আদিবাসীদের খাদ্য আর বাজনার নিদর্শন রয়েছে এইখানে। আছে ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক আশাক।

উল্কাপিণ্ড, ফসিল, শিবালিক অঞ্চলে পাওয়া জীবাশ্মগুলির মধ্যে ভারতীয় হাতির পূর্বপুরুষ 'স্টেগাডন গণেশ' নামের বিশাল হাতির জীবাশ্ম উল্লেখ করার মতো। আছে নানা জাতের জলচর, স্থলচর প্রাণী, পাখির কঙ্কাল। লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হাড়ের কাঠামো। আর যে কত কি তার কথা লিখে বোধহয় শেষ হয় না।

শ্যামলবাবু আমাদের জানান, নিয়মিত সেমিনার, স্লাইড শো হচ্ছে যাদুঘরে। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী এখানে এসে বক্তৃতা করে যান, তাঁদের কাজের ওপর। সঙ্গে কখনও রঙিন সিনেমা বা স্লাইড শো থাকে।

একজিবিট অফ দি মান্থ এখন যাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নানান বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতি মাসেই করা হয়ে থাকে প্রদর্শনী। এছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ।

ইতিহাস এবং সময়কে বুকের মধ্যে আঁকড়ে থাকা এই কংক্রিটের খাঁচাটি এখন শিক্ষামূলক কাজকর্মে ক্লান্তিহীন। নানান ধরনের অনুষ্ঠান হয় এখানে। তাব জন্যে কখনও কখনও মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে সফল প্রতিযোগীদের।

1989 সালে যাদুঘর পার্কস্ট্রিট এবং এসপ্লানেডের পাতাল রেল স্টেশনে নেমে এসেছে মানুষকে আরও বেশি বেশি করে তথ্য জানানোর জন্যে। সেখানে প্রদর্শনী হবে নিয়মিত। কলকাতায় জবচার্ণকের আসার 300 বছর পূর্তি উপলক্ষে যাদুঘর নানা দায়িত্ব নিয়েছে। অনেক ধরনের অনুষ্ঠান হবে।

যারা ভারতবর্ষ থেকে দর্শক আসেন কলকাতার এই যাদুঘরে। ছুটির দিনে বাড়ে ভিড় আর ভিড়। টিকিট গেটের সামনে লম্বা লাইন। গোটা ভারতবর্ষ এক হয়ে যায়।

শ্যামলবাবুর থেকে আমরা জানতে পারি, ক্রমেই বাড়ছে যাদুঘরের দর্শক। বছরে দশ লক্ষ মানুষ আসেন এখানে। ছুটির দিনে এঁদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

[এই রচনাটি তৈরি করতে গিয়ে যাদুঘরের বর্তমান এডুকেশন অফিসার শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীর 'যাচ্ছ কোথায় যাদুঘরে'-এর থেকে অনেক সাহায্য নেয়া হয়েছে।]

যাদুঘরের নতুন বাড়ি

1864 সালের মধ্যেই লাখ খানেক লোক দেখে নিয়েছে যাদুঘর। জিনিসপত্র আর দর্শক উপচে পড়ছে যেন। তাই তিন বছর পর 1867 সালে চৌরঙ্গীর ওপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো এই বাড়ির। যে জমিতে এই বাড়ি হলো, সেখানে ছিল একটি ইস্কুল বাড়ি। সেটা পরে দার্জিলিংয়ে উঠে যায়। আট বছর পর চৌরঙ্গীতে তৈরি হলো প্রাসাদপুরী একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে। বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ডব্রউ গ্র্যাণ্ডভিল। এই শহরের আরও দুটি বিশাল বাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি। তার একটি জি. পি. ও। অন্যটি হাইকোর্ট।

কেমন করে যাবে ?

ভারতীয় যাদুঘরের ঠিকানা ঃ

- ☐ 27 জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-700016

ফোন ঃ 29-5699
29-8948
29-8931

- ☐ খোলার সময় ঃ
মার্চ—নভেম্বর (সকাল 10টা—বিকেল 5টা)
ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারি (সকাল 10টা—বিকেল 4-30 মিনিট)
- ☐ যাদুঘরের ছুটি ঃ সোমবার, 26 জানুয়ারি, দোলযাত্রা, 15 আগস্ট, ঈদ-উলফেতর, 2 অক্টোবর, দেওয়ালী
- ☐ টিকিটের দাম ঃ বড়দের 2টাকা (মাথাপিছু), দলবেঁধে ছাত্ররা এলে কোনো টিকিট লাগে না।
- ☐ দেখার জায়গা ঃ আর্কিওলজি, আর্ট, অ্যানথ্রোপলজি, জুলজি, বোটানি এবং আরও কিছু বিদেশী নিদর্শন।

[এখানে ব্যবহৃত আলোকচিত্র দুটি সমিত মণ্ডল কর্তৃক গৃহীত।]

সুন্দর
ও মজবুত
জুতো মানেই
রাদু

Radu®
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
ESTD. 1901
75A, COLLEGE STREET CALCUTTA-700 073
PHONE: 31-2402
18, GARIAHAT ROAD, CALCUTTA-700 019
PHONE 42-8393

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

তবু ব্যাপারটা তোকেই বলছি। শোন, আমি এমন একটা জিনিস তৈরী করতে চলেছি, যার সাহায্যে মানুষের দেহে এমন এক রূপান্তর ঘটবে যে সাধারণ চর্ম চোক্ষে তাকে দেখা যাবে না।
তার মানে অদৃশ্য! এ কি করে সম্ভব হবে?
পুঁটি, বিজ্ঞানের যুগে সব কিছুই সম্ভব। আমিও জিনিসটা প্রায় কব্জা করে এনে ফেলেছি। আর কয়েকটা সিটি বাকি। ব্যাস্, তারপরই দেখবি-
বুম্!
বাপরে!
আরে, এ কি কাণ্ড! সিটির বদলে বুম্! ব্যাস্ অদৃশ্য!
খুদের গবেষণাই তো ছিল অদৃশ্য হওয়া নিয়ে! বুঝেছি, ও নিজের উপরই তা প্রয়োগ করেছে!
কী আশ্চর্য! কী কাণ্ড! কী মজা! খুদের গবেষণা সার্থক!
কিন্তু এমন করে হঠাৎ নিজেই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে খুদে খুব অন্যায় করেছে! এখন এর ফলাফলটা কে বিচার করবে?
জিনিসটা দারুণ বের করেছে! একেবারে কুকারের ঢাকনা শুদ্ধু হাওয়া! এখন ও কোথায় আছে, কি করছে কে জানে!

কি মুসকিল, অদৃশ্য হয়েছিস বলে কি একটু সাড়া-শব্দ দিতে নেই! এ অবস্থায় গলার কি কোনো সাউণ্ড থাকে না? কে জানে!
ওঁয়াফস্! উঁফস্! ওঁরে দাঁদুরে, গেঁলুম রেঁ।
অ্যাঁক! এ-এতো খুদের গলা মনে হচ্ছে!
শব্দটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে!
আঁঃহা, উঁঃহ্, ওরে খুঁটি আ-আঁমাকে ধর! ওফস্!
সেরেছে! খুদে, অদৃশ্য হয়েছে না ভূত হয়েছে? কেমন বিদঘুটে স্বরে কথা কইছে! এতো ভাল কথা নয়!
আঁঃ-উঁঃ! ওরে আঁমাকে শিগগির উদ্ধার কর! ইয়াঃ!
ওরে বাবারে! খুদে, এ ভাবে অদৃশ্য হয়ে আমার সঙ্গে ইয়ারকি মারবি না! ভাল চাস তো সশরীরে দেখা দে। নয়তো আমি সব্বাইকে তোর গবেষণার কথা ফাঁস করে দেব।
উঃ, ওরে রাসকেল ইডিয়েট্ ননসেন্স্! আ-আমি অদৃশ্য হইনি আমি উপরে। দয়া করে উপরের দিকে তাকা! আঃহ্!
এ আবার কি কথা!
সর্বনাশ! তুই ওখানে? অদৃশ্য থেকে ফিরে এসেছিস? বাব্বাঃ, বাঁচালি! ধন্য তোর গবেষণা আর আবিষ্কার! এবার নেমে আয় বাবা।
ইয়াঃহু! আমি যে নামতে পারছি নারে!

আর ন্যাকামী করিসনি! নেমে আয় বলছি— নইলে ভাল হবে না।
আঃ! উঃ! অপস্!
দড়াম্-
গঁক!
সাব্বাশ!
অদৃশ্য হওয়া— একি মুখের কথা! খুদে বলেই এটা সম্ভব হল! এখন আর নয়, উঠে পড়। এবার আমি একটু টেস্ট করবো। কি হলো?
আরে, এতো নড়ছেই না! ওবাব্বা, এ যে বেহুঁশ! এতক্ষণ অদৃশ্য হয়েছিল, একটা টেনশন আছে তো।
ওঃ, আঃ, আহ্! অ-আ-আমি কোথায়? এঃ একটু জল!
এই তো কথা কইছে! খুদে কনগ্র্যাচুলেশন। তুই এতক্ষণ অদৃশ্য হয়েছিলি। তোর গবেষণা সাকসেসফুল!
গ্র্যাপস্! গ-গবেষণা!
কেন তোর মনে নেই? বুক্কারের মধ্যে গবেষণা-অদৃশ্য হওয়ার আরক, তারপর হঠাৎ-
হঠাৎ-আরক-অদৃশ্য-গবেষণা-বুক্কার—
তু-তুই এমন করছিস কেন? তোর—
ত-বে-রে! গেট আউট হিঁয়াসে! নয়তো পেঁদিয়ে পদ্মলোচন দেখিয়ে দেব! বেরও-ও-ও!
যাঃ বাব্বা! আমি কি দোষ করলুম?
বোধহয় আবিষ্কারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে এমন খেপে গেছে!

কাগজের কতকথা

কার্তিক ঘোষ

প্যাপিরাস থেকে যেমন ইংরেজীতে পেপার কথাটা এসেছে, তেমনি বাংলায় তর্জমা করে হয়েছে কাগজ। মিশরের মানুষ প্রথম যখন প্যাপিরাসে লেখা লিখি শুরু করে, জানো নিশ্চয়ই কাগজ তখনও আবিষ্কার হয়নি। কারণ, প্যাপিরাস তো কাগজ ছিল না, ছিল ঐ গাছের ছাল।

সভ্যতার ইতিহাসে কাগজ এসেছে অনেক পরে।

চীনদেশেই তার জন্ম। চীনারাই কাগজকে বলে কায়গৎ। আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে আমরা একদিন জেনেছিলাম, কাগজের জন্মসাল 105 খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু পরে চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদরাই আবিষ্কার করেছেন এমন তিন টুকরো কাগজ, যার বয়েস আরো দেড়শ বছর বেশি।

প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে কাগজের কথা যতটুকু জানা যায়, ততটুকুই বলতে পারো চীনদেশের গল্পে জমজমাট।

যখনকার কথা বলছি, তখন হো টি ছিলেন চীনের সম্রাট। উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন, সাইলুন নামে এমন একজন মানুষ, নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরেই যিনি একদিন উঠে এসেছিলেন অনেক ওপরে। অস্ত্র কারখানা থেকে শুরু করে কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব কটাতেই তিনি ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। কাগজ তৈরির কাজে তিনিই এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাইলুন যখন সম্রাটকে কাগজ আবিষ্কারের আনন্দ সংবাদটি দান করেছিলেন, তখন ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় উঁকি দিচ্ছে 105 সাল।

এই কাগজের কথা শুনে সম্রাট তাঁকে সম্মানজনক উপাধি দান করেন।

তা, কাগজের কথাতেই ফিরে আসি আবার।

লেখার কাজে প্রাচীন চীনে ব্যবহৃত হতো বাঁশ, রেশম আর কাপড়। কিন্তু বাঁশের ফলকে লিখলে কি হবে, জিনিসটা বড় ভারি। তার ওপর রেশম আর কাপড়ে লেখার খরচও কম নয়। সাইলুন পড়লেন চিন্তায়। লেখার জন্যে বেশি পয়সা ব্যয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে মুস্কিল।

তাহলে কি হবে?

থেমে থাকার মানুষ নন সাইলুন। পরীক্ষা চালালেন ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, গাছের ছাল, ছেঁড়া কম্বল, ফালতু শন মাছ ধরার টুকরো হওয়া জাল—এই সব দিয়ে কিছু একটা তৈরি করা যায় কি না!

জলে ভিজিয়ে, হামানদিস্তায় পিষে, এমন একটা মণ্ড তৈরি করলেন প্রথম, সেখান থেকেই পরিকল্পনাটা পরিষ্কার হলো মাথায়। জলে ভিজে থাকা ফালতু জিনিসের মণ্ড চৌকোনা বাঁশের ফ্রেমে বাঁধা পাতলা কাপড়ের চালুনিতে আটকে থাকত দিব্যি। সেই মণ্ড রোদে শুকিয়ে দুখানা পাথরের মাঝখানে চাপা দিয়ে রাখলেই তৈরি হতো এক একখানা কাগজ।

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কোরিয়া থেকে পাড়ি দিলেন জাপান। চীন সাম্রাজ্যের মধ্যেই তখন ছিল কোরিয়া। সেই জন্যেই বোধহয় বৌদ্ধ সন্নাসীদের মধ্যে ডোবিও নামে ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি জানতেন কাগজ তৈরির সব কলাকৌশল। আর তাঁর জন্যেই বলতে পারো জাপানে জাঁকিয়ে বসেছিল কাগজ শিল্পের উদ্যোগ।

তারপর এলো অষ্টম শতাব্দির সেই পালা বদলের হাওয়া। সমরকন্দের যুদ্ধে মুর আর আরবরা চীনদের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী করেছিল এমন কিছু সৈন্যকে যারা জানত কাগজ তৈরির কলাকৌশল। তাই যা হবার তাই হয়েছিল। আরবরা যুদ্ধ বন্দী কারিগরদেরই লাগিয়েছিল কাগজ তৈরির কাজে। বাগদাদ আর সমরকন্দে গড়ে উঠেছিল কাগজ তৈরির বড় বড় শিল্প কেন্দ্র। সেখান থেকেই একদিন প্যাপিরাসের দেশ মিশরে পৌঁছে গিয়েছিল আজকের এই কাগজ, চীন দেশেই যার জন্ম থেকে শিশুকালটা কেটেছিল।

হ্যাঁ, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পৌঁছেই কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটে স্পেনে। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। তবু চীনের কাছে সব দেশেই কৃতজ্ঞ। কারণ, তারাই প্রথম শিখিয়ে দিয়েছে কাগজ তৈরির কলাকৌশল।

ছাপাছুপির ব্যাপারেও চীনদেশের নাম প্রথম। কাঠের ওপর খোদাই করে ছাপার জগতেও প্রথম পদক্ষেপ তাদের। সে কথাও কিন্তু কম কৌতূহলের নয়। সে আর এক গল্প। ইতিহাসের আর এক অধ্যায়। অন্য সময় বলব।

কুড়কুড়ি, তাঁতিশাল, হুগলী।

মানিপ্ল্যাণ্টের জীবন ধারণ

কমল কুমার মৈত্র

সাজানো ড্রইংরুম। সোফাসেট। সেণ্টার টেবিল। পেপার ওয়েট চাপা পত্রিকা। টবে রবার গাছ, আর টেবিলের ওপর কাচের পাত্রে জল রাখা একটি মানি প্ল্যাণ্ট। এ দৃশ্য কারোরেই অপরিচিত নয়। সকলের বাড়িতেই দেখা যায়। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি যে ঐ সামান্য পরিমাণ জলে মানি প্ল্যাণ্ট বেঁচে থাকে কিভাবে? জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় কোথা থেকে?

আমরা জানি যে, সবুজ উদ্ভিদ সূর্য্যালোকে পাতায় সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে পরিণত করে। ঘরের মধ্যে সূর্য্যালোক না থাকলেও বৈদ্যুতিক আলো মানি প্ল্যাণ্টের সালোক-সংশ্লেষের অসুবিধা ঘটায় না। কিন্তু কার্বোহাইড্রেটই একমাত্র প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রধান প্রয়োজন প্রোটিন যার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন আসে কোথা থেকে? পাত্রের জলে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন দ্রবীভূত আছে তা সামান্যই। তাছাড়া নাইট্রোজেন মুক্ত জল বা ডিসটিলড্ ওয়াটারে রাখলেও মানি প্ল্যাণ্টের বৃদ্ধির কোনও তারতম্য হয় না। তবে কি বাতাসের নাইট্রোজেন এরা শোষণ করে নেয়? সিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধে। তাদের কাজ বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করে উদ্ভিদকে দান করা। অবশ্য তার বিনিময়ে উদ্ভিদদেহ থেকে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্যরস শুষে নেয়। তবে কি মানি প্ল্যাণ্টও নিজের দেহে এই সকল ব্যাক্টিরিয়া ভাড়াটে রাখে? কিন্তু না। তাও সম্ভব নয়। কারণ মানি প্ল্যাণ্ট জলেই ডোবানো থাকে। সেখানে ব্যাকটিরিয়া থাকলে তাকে জল থেকেই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়াগুলি জল থেকে বাতাস শোষণে অক্ষম। বিজ্ঞানীরা পড়লেন ভাবনায়! তাঁরা ভাবলেন যে, পাতায় যে মোমের মত আস্তরণ থাকে তাতেই ব্যাকটিরিয়ার বাস। প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেল যে মানি প্ল্যাণ্টের পাতা ধোওয়া জল অন্যান্য উদ্ভিদে যাতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে তাতে স্প্রে করলে ঐ সব উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। কিন্তু এই অভিমতকে মিথ্যা প্রমাণিত করল সহজ একটি পরীক্ষা। মানি প্ল্যাণ্টের পাতা কোনও ব্যাকটিরিয়া নাশক পদার্থ দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিলেও বৃদ্ধির কোনও তারতম্য হয় না। তাহলে এরা বেঁচে থাকে কিভাবে?

ভাবনা বাড়ল বিজ্ঞানীদের! সত্যই তো, নাইট্রোজেন ছাড়া বৃদ্ধি কিভাবে সম্ভব? চলল কারণ অনুসন্ধান। কারণ অবশ্য মিলল আর তা খুবই মজার আর আশ্চর্য্যজনক। বিজ্ঞানীরা বললেন মানি প্ল্যাণ্ট আদৌ বৃদ্ধি পায় না। শুধু বেঁচে থাকে মাত্র। নতুন পাতা সাজালেও তা অন্য একটি সজীব পাতা শুকিয়ে গেলে তবেই গজায়। সমগ্র শুষ্ক ওজন (Dry weight) অর্থাৎ, মানি প্ল্যাণ্টে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদির মোট পরিমাণ সবসময় একই থাকে। মানি প্ল্যাণ্টে খুবই কার্য্যকরী সংবহন তন্ত্র (Transiocation System) আছে যার ফলে শুকনো পাতা থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সহজেই নতুন পাতায় স্থানান্তরিত হতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে সজীব পাতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ শুকনো পাতা অপেক্ষা বেশি। পাতা শুকিয়ে গেলে প্রোটিন সহজেই অন্য সজীব অংশে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং, সাধারণ চোখে মানি প্ল্যাণ্টের বৃদ্ধি হয় দেখাগেলেও তা আসলে বৃদ্ধি নয়, শুধুমাত্র জীবন ধারণ।

33, জয় নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, বরানগর, কলিকাতা- 36

এ্যাস্‌বেস্টস্‌

পবিত্র পাল

নির্মলের বয়স দশ। কিন্তু কথা-বার্তা, শারীরিক গঠন চলাচলনে তাঁকে তার বয়েসের তুলনায় বেশ বড় দেখায়। ওর জানবার আগ্রহ প্রচুর। যা কিছু অপরিচিত, যা কিছু অজানা তা জানবার জন্যে বড়দের জিজ্ঞেস করে। তবে সে বেশির ভাগই তার বাবা নিরূপম বাবুর থেকে জেনে নেয়।

গত পরশু সে তার বাবার সাথে শহরের এক ভয়ংকর অগ্নিকান্ড দেখতে গিয়েছিল। নির্মল আগে কখনো এমন অগ্নিকান্ড দেখেনি। প্রায় লাখ পাঁচেক টাকার সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফায়ার বিগ্রেডের লোকেরা অতিকষ্টে আগুন নেভায়।

বাসায় এসে নির্মল বাবাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবা, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের গায়ে আগুন লাগছিল না কেন?

বাবা ঃ তারা একপ্রকার পোষাক পরেছিল। তাই তাদের গায়ে আগুন লাগছিল না।

নির্মল ঃ পোষাকটির নাম কি?

বাবা ঃ ফায়ার প্রুফ পোষাক। শুধু যে আগুনেই পোড়ে না; তাই নয়, জলেও ভেজে না। এ পোষাক এ্যাস্‌বেস্টস্‌ থেকে তৈরী।

নির্মল ঃ এ্যাস্‌বেস্টস্‌ কি বাবা?

বাবা ঃ এ্যাস্‌বেস্টস্‌ সম্বন্ধে তুমি জানতে চাও? তা হ'লে বলছি। কিন্তু এর আগে তোমার মাকে এক কাপ চা খাওয়াতে বল।

নির্মল নূতন জিনিষ জানবার আগ্রহে চট করে ছুটে গিয়ে মার কাছে চায়ের কথা বলে আসল। সে আসার পর নিরূপমবাবু শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য।

এ্যাস্‌বেস্টস্‌ পাওয়া যায় পাহাড়ের ফাটলের মাঝ থেকে। এ্যাস্‌বেস্টস্‌কে খনিজপদার্থরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও রং-এর এ্যাস্‌বেস্টস্‌ পাওয়া যায়। শক্ত ও সবগুলো সমান নয়। অনেক রকমের এই এ্যাস্‌বেস্টস্‌-এর মধ্যে ক্রিসোলাইট (Chrysolite) পাথরই প্রধান। এ পাথরটার আঁশ বাঁকা-বাঁকা কুণ্ডলী পাকানো।

নিরূপম বাবু প্রায় একশ্বাসেই যেন এ কথাগুলো বলে ফেললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিতে দিতে শুরু করলেন—

আজকাল কাপড়-চোপড় তৈরি করবার জন্যে যে সব এ্যাস্‌বেস্টস্‌ কাজে লগোনো হচ্ছে তার আঁশগুলো লম্বা। আর দেখতে খুব সরু।

নির্মল চোখদুটো ডাগর ডাগর করে বাবার দিকে চেয়ে আছে আর গভীর মনোযোগে কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু এমন সময় মা চা নিয়ে আসতে নির্মল খুব বিরক্ত বোধ করল। বাবা চা শেষ করে আবার বলতে লাগলেন—

এ্যাস্‌বেস্টসের সুতো অর্থাৎ আঁশ দিয়ে কাপড় তৈরি হয় প্রথম ইতালিতে—সেই 1870 খ্রীষ্টাব্দে। এখন যেভাবে এ্যাস্‌বেস্টসের ব্যবহার চলছে তখন কিন্তু এত বেশি ছিল না। বর্তমান জগতে প্রতিবছর গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ টন এ্যাস্‌বেস্টস্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে। আর বেশির ভাগ পাওয়া যাচ্ছে কানাডা থেকে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালি, রাশিয়া আর আমেরিকা থেকেও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে।

ক্রিসোলাইট এ্যাস্‌বেস্টস্‌ পাহাড়ের সংকীর্ণ ফাটলের মাঝ থেকে উদ্ধার করা হয়। তারপর একটা বৈদ্যুতিক নির্মিত চাকা ঘুরিয়া পাথরগুলো এ্যাস্‌বেস্টস্‌ থেকে আলাদা করা হয়। আর যে সব গুঁড়োপাথর থাকে, সেগুলোকে একপ্রকার বাতাস বহানো মেসিনের সাহায্যে এ্যাস্‌বেস্টস্‌ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। তারপরই এ্যাস্‌বেস্টসের প্রকৃত আঁশ বেরিয়ে আসে। আঁশগুলোকে তামার সাথে মিশিয়ে এক-প্রকার সরু সুতো বানানো হয়।

নিরূপমবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন—এ হলো এ্যাস্‌বেস্টস্‌ তৈরির পদ্ধতি। তোমাকে আগেই বলেছি, এ্যাস্‌বেস্টসের ব্যবহার বর্তমানে খুব বেড়ে গেছে। আজকাল কাঠের আঁশের সাথে এ্যাস্‌বেস্টসের আঁশ মিলিয়ে একপ্রকার কাগজ তৈরি করা হয় যা আগুনেও পুড়ে না, জলেও ভেজে না। কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না! কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্যি কথা। এই বলেই নিরূপম বাবু তাঁর ইতি টানলেন। আর নির্মল নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারে বাবার কথা-গুলোকে স্বযত্নে রেখে তার পড়ার ঘরে আগামীদিনের স্কুলের পড়া তৈরি করতে চলে গেল।

বঙ্গীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডিব্রুগড়-786001

তেজস্ক্রিয়তায় শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি

ডাঃ নিত্যগোপাল বসু

আমরা জানি পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হল পরমাণু, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রনরা। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের অস্থিরতার জন্য তারা আলফা ও বিটা কণা এবং গামা রশ্মি বিকিরণ করে। স্থিরতা ফিরে পায়। এই ঘটনা হল— তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। আর যে সকল মৌলিক পদার্থ এমন ধরনের বিকিরণের অংশগ্রহণ করে তাদের বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। প্রকৃতিতে কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান মিলেছে। পারমাণবিক-চুল্লী বা সাইক্লোট্রন যন্ত্রে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় মৌলের সৃষ্টি করা সম্ভব।

কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রাণীদেহে কতটুকু ক্ষতি করবে তা নির্ভর করে ঐ পদার্থের পরিমাণ এবং কত সময় ধরে তা প্রাণী দেহে প্রবেশ করছে তার ওপর। নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা যদি অল্প সময়ে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে তার ক্ষতির পরিমাণ, ঐ একই পরিমাণ বিকিরণ দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে প্রবেশ করার চেয়ে বেশী হবে। তবে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা শরীরে প্রবেশ করছে তা বোঝাতে 'কারমা' নামক শব্দকে ব্যবহার করা হয়। কারমা মাপা হয় 'গ্রে' এককের সাহায্যে। 'গ্রে' হল প্রাক্তন একক 'র‍্যাড'-এর একশ গুণ। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়ক্ষতি সাধারণতঃ ঐ পদার্থ শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটলে কিংবা তেজস্ক্রিয় পদার্থ শরীরের সংস্পর্শে এলে তবে হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সচরাচর শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে, খাদ্য দ্রব্যের মিশ্রণে, আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। শ্বাসকার্যের সময় তা শরীরে প্রবেশ করে। ঐ তেজস্ক্রিয় কণা বৃষ্টির জলে নেমে আসে মাটিতে। জমা হয় উদ্ভিদে ও অপরাপর প্রাণীদেহে।

তেজস্ক্রিয় ঐ জল পান করলে কিংবা তেজস্ক্রিয়তা যুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বা উদ্ভিদ বা প্রাণীজাত দ্রব্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে আমরা তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়তে পারি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ শরীরের যে স্থানে ছোঁয়া লাগবে সেখানে স্থানিক লক্ষণ দেখা দেবে।

সামগ্রিকভাবে সারা শরীরে তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। দেখা গেছে, চার দশমিক গ্রে বিকিরণ যদি সারা শরীরে মাত্র একদিনের জন্য লাগে তবে একশোজনের মধ্যেই পঞ্চাশজনই দু সপ্তাহের মধ্যে মারা যাবেন। তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়া যদি শুধুমাত্র ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা লাল হ'য়ে ওঠে, রস জমে ফুলে যায়। ফোস্কা পড়ে, শেষে ঘা হয়—যা সহজে সারতে চায় না। তেজস্ক্রিয়তার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে খুব দ্রুতবৃদ্ধি হয় এমন সব কোষকলার ওপর। যেমন, অস্থিমজ্জার কোষকলা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। যাকে বলে রক্তাল্পতা। শরীরের শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমে যাবার ফলে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কেননা, আমাদের শরীবের রক্ষাবাহিনীর অন্যতম প্রধান সৈনিক এই শ্বেত কণিকারাই। এদের সংখ্যা হ্রাসে তেজস্ক্রিয় কবলিত মানুষ সহজে রোগজীবাণুর আক্রমণে পড়ে—অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তের অনুচক্রিকারা কেটে গেলে রক্তজমাট বাঁধায়। এদের সংখ্যা কমে যায় বলে রক্ততঞ্চন ব্যাহত হয়—প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।

খাদ্যনালীর ওপর তেজস্ক্রিয়তার যথেষ্ট প্রভাব আছে। গা বমি বমি করতে থাকে। ক্রমাগতঃ বমি হতে থাকে। সাথে রক্ত পায়খানা। আক্রান্ত ব্যক্তি দু'এক সপ্তাহের মধ্যে মারা পড়েন। মস্তিষ্কের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব অতি মারাত্মক। আক্রান্ত ব্যক্তি হঠাৎই অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রবল খিঁচুনী হ'তে থাকে। শেষে ঐ ব্যক্তি আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েন। দু'এক দিনের মধ্যেই এরা মারা যায়।

তাছাড়া, পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। সৃষ্টি করবে বিভীষিকা, আতংক, উন্মাদনা, মানসিক অবসাদ। পরমাণু-বোমা কবলিত এলাকায় ক্যান্সার দেখা দেবে মহামারী হিসাবে। ব্লাড-ক্যান্সার বা লিউকেমিয়ার প্রকোপ বাড়বে। ফুসফুস, হাড়, থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার দেখা দেবে ভীষণ ভাবে।

পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে 10,000 মেগাটন শক্তি সম্পন্ন পরমাণু বোমা। যদি পরমাণু যুদ্ধ বাধে তবে তার পরিণতি আন্দাজ করা মুশকিল। এখন সময় এসেছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার—পরমাণু শক্তিকে শান্তির কাজে লাগাবার।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, 99 শরৎ বোস রোড, কল-26

মৎস্যপুরাণ

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

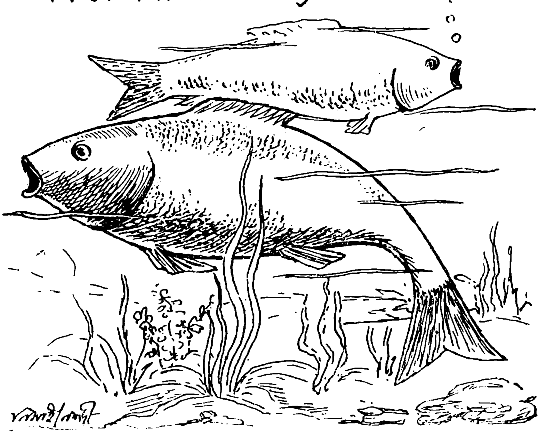

একটানা প্রায় সত্তর বছর কলকাতায় বাস করলেও আসলে কিন্তু আমি একজন বাঙ্গাল—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের লোক। তবে তার আগে একটা 'ছিলাম' শব্দ যোগ করে নিলেই ভালো হয়, কারণ এখন তো ওদেশটা আমাদের কাছে একটা "ফরেন কান্ট্রি"—যেতে হলে পাসপোর্ট লাগে ভিসা লাগে, আরও কত কি হাঙ্গামা-হুজ্জোৎ পোহাতে হয়।

কিন্তু হলে কি হবে, পূর্ববঙ্গীয় 'কালচার' যে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই কালচারের একটি হচ্ছে "মৎস্য-কালচার"—খাঁটি বাংলায় যাকে বলা যায় মৎস্যপ্রীতি।

দেশের বাড়িতে রয়েছে বিরাট দীঘি। জাল ফেললে এক সঙ্গে 10/15/20 কেজি ওজনের বেশ কয়েকটা রুই কাৎলা উঠে আসতই। যত খুশি 'খাও খিলাও, দাও দিলাও'। আর তা যদি ইচ্ছা না থাকে একটা ছিপ নিয়ে যুৎসই করে বস, শিকারীর মত হুইল ছেড়ে আর গুটিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে তুলতে পারলে তাতেও কোন্ না 2/1টা ঢাউস মাছ উঠে আসবেই। বিলেতে, শুনেছি, এও একরকম ছুটী কাটাবার খেলা—অ্যাংলিং।

কিন্তু তাই বলে ও রকম জীবহত্যা করে আনন্দ?

আরে, ছেড়ে দাও ও-সব বড় বড় লেকচার। মানুষের খাওয়ার অভ্যাসটা নির্ভর করে সে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর। পূর্ববাংলা হচ্ছে জলের রাজ্য। বর্ষার পর পাশের বাড়ি যেতে হলেও নৌকো লাগে। ওখনকার লোকে মাছ খাবে না তো খাবে কে? তাই ওখানকার গোঁড়া বৈষ্ণব গুরুদেবরাও দেখেছি শিষ্যদের বিধান দিচ্ছেন—দীক্ষা নিয়েছ, এখন থেকে ডিম, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এমন কি মুসুরীর ডাল খাওয়াও চলবে না। তবে মাছ? ওটা খাওয়া যেতে পারে। (গুরুদেব হয়তো নিজেও ওটা ছাড়তে পারেন নি।) আমি বাবা, এসব দীক্ষাটিক্ষার ধার ধারি না। "আপ্ রুচি খানা" এই হিন্দী প্রবাদ বাক্যে আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু কলকাতায় সে সুখ কোথায়? তাই ঐ মাছের লোভেই এক সময় দেশের বাড়িতে গিয়ে ছুটী কাটিয়ে আসতাম। তখন দেশ ভাগ হয়নি, বাংলাদেশ বলতে আমরা গোটা বাংলাকেই বুঝতাম, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বলে কোন ভাগাভাগির প্রশ্নটা উঠত না।

কিন্তু দেশ যে সত্যিই একদিন ভাগ হয়ে যাবে, কলকাতার আশপাশে "উদ্বাস্তু" নামে এক নতুন ধরণের মানুষেরই হাতে তৈরি মানুষের ভিড় হবে, জলা-জঙ্গলে ভরা জায়গাগুলোও যে ভরাট হয়ে লোক গিজ্‌গিজ করা ছোট ছোট শহর বা উপশহর হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ ভাবতেও পারত না। তার আগে কলকাতা থেকে 10/15 মাইল গেলেই জলের দরে জমি বিক্রি হ'ত।

তাই, দেশ বিভাগের অনেক আগেই একদিন মনে হ'ল যখন তখন ভিড় ঠেলে রাত দশটায় গিয়ে ঢাকা মেলে চাপ-তার পর গোয়ালন্দে নেমে স্টীমার এবং অবশেষে দীর্ঘ পথ নৌকো—ওসব হৈ হুজ্জুৎ না করে তার চাইতে কলকাতার আশে পাশে একটা পুকুর সমেত জমি কিনে ফেললেই হয়! যতটা সস্তায় পাওয়া যায় ততই ভালো।

সুযোগ সত্যিই ঘটে গেল। খবর পেলাম এখান থেকে 7/8 মাইল দূরে সোনারপুরের কাছে এক ভদ্রলোক তাঁর জায়গা-জমি পুকুর সমেত সব বেচে দিয়ে কাশীবাসী হতে ইচ্ছুক হয়েছেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। ছেলেপিলে নেই, শুধু স্বামী আর স্ত্রী। তাই জীবনের বাকি ক'টা দিন বাবা বিশ্বনাথের চরণেই কাটিয়ে যাবেন। আর যদি ওখানেই মারা যান তবে তো নিজেই একজন শিব হয়ে যাবেন। কবি রামপ্রসাদের গানটা তাঁর জানা ছিল। সেই যে—"মন তুই কি যাবি কাশী? চল বিশ্বেশ্বরকে দেখে আসি!" তার পর—"কাশী মলে শিব হইবি, কেন তুই অন্যত্র যাবি? কত লাখে লাখে পাপী মরে

শিব হয়েছেন রাশি রাশি।" অবশ্য মরতে হবে গঙ্গার এপারে যেদিকে বিশ্বনাথ থাকেন, নদীর ওপারে মরলে নাকি পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা আছে।

যাই হোক, ভদ্রলোক 'শিব' হলে আমরাও খুশি হব—আপাততঃ—এই সুযোগে যদি তাঁর পুকুরসহ জমিটুকু সস্তায় কিনে নেওয়া যায়। জমির ওপর আমার ততটা আগ্রহ না থাকলেও পুকুরটার ওপর ছিল। যে দামে তখন কলকাতায় এক কাঠা জমি বিক্রি হত সেই দামেই বিঘে আড়াই পুকুর জমি। বাঃ! ঈশ্বর, তুমি সত্যি আছ।

দেখলাম স্থানীয় লোকদেরও জমি-পুকুরের ওপর তেমন লোভ নেই। কেনই বা থাকবে? তাদের সকলেরই নিজস্ব কিছু জমিজমা আছে। যাদের নেই তাদের টাকাও নেই কিনবার।

অতএব ?

অতএব একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে জমিটা আমার হাতেই চলে এল। অবশ্য দলিল-টলিল করতে ওখানকার কর্মচারীদের অল্প কিছু উপরিও দিতে হ'ল। ওটা নাকি ওরা পেয়ে থাকেন। আইন মতে নয়, ট্র্যাডিশন মতে; অর্থাৎ ওটা একটা প্রথা—বহু দিন যাবৎ চলে আসছে। যাক্ গে! ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হওয়া এ যুগে চলে না।

তোড়জোড় তখনই শুরু করেছিলাম। এবারে ঐ পুকুরে ভালো জাতের মাছের চারা অর্থাৎ মাছের ছানা ফেলব। তার পর 2/4 বছরের মধ্যেই সে মাছ ইয়াব্বড় তাগড়াই হয়ে উঠবে। তখন ধর তার ঘাড়। আর, ভগবানের দয়ায় যদি খুব বেশি হয় তা হলে সেই "খাও খিলাও, দাও দিলাও।" মৎস্যহত্যার পাপ কিঞ্চিৎ পুণ্য দিয়ে ঢাকা যাবে। পূর্ববঙ্গের মৎস্য কালচারও এখানে বসেই মেটানো যাবে।

পুকুরটা কিন্তু ভর্তি ছিল নানা রকম জলজ গাছে। তার মধ্যে নানা রকম পানা, এমন কি কচুরিপানাও কিছু ছিল। তা থাকুক না, পুকুরের জল তো খাব না, খাব ঐ পুকুরের মাছ। মাছ আর গাছ কি জলের মধ্যে সহাবস্থান করতে পারে না? তা ছাড়া 2/4টে লোক লাগিয়ে গাছগুলো তো তুলে ফেলাও যায়—কয়েকদিনের মধ্যেই।

কিন্তু যা ভাবছিলাম তা হ'ল না। গাছগুলি বোধ হয় জলে বাস করে করে অমর হয়ে গেছে। যত তোলা যায় তত নতুন করে গজায়। আর মাছ? প্রতি বছরই হাঁড়ি হাঁড়ি মাছের ছানা ছাড়া হতে লাগল। মাছ যে হ'ল না, যাট, একথা অস্বীকার করব না। কিন্তু অত ভালো জাতের মাছ অত ছোট ছোট কেন? দেশের বাড়িতে এক একটা ' যেমন বড় আর পুষ্ট হয় এগুলি তার ধারে-কাছেও যায় না আকারে, না ওজনে, না পুষ্টিতে। উপরন্তু সংখ্যায়ও তেমন বাড়ে না। আবার জন্মালেও অনেকগুলি বাঁচেও না বেশি দিন।

নাঃ সাধ আর পূর্ণ হ'ল না। বয়স বাড়ছে, দাঁতও পড়ে যাচ্চে একটি একটি করে, এর পর হয়তো চর্বণ শক্তিই হারিয়ে ফেলব। তখন আর মাছ খাওয়ার সাধও মিটে যাবে। আর বাজার থেকে কিনে খাওয়া? দেশ এখন স্বাধীন। সুতরাং "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" 40/50 টাকার কমে এক কেজি কাটা পোনাও পাওয়া যায় না। লগনসা থাকলে তো 60/70 টাকাতেও ওঠে।

এরই মধ্যে একদিন ব্যোমকেশ এসে হাজির। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু হৃষীকেশের ছোট ভাই। অনেকদিন বিলেতে ছিল। জুয়লজি অর্থাৎ প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে রিসার্চ করত। এখন দেশে ফিরে এসে একটা কলেজে পড়াচ্ছে আর অবসর সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেশের হালচাল দেখতে।

একটুও বদলায় নি ব্যোমকেশ। এসেছে ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে। পায়ে একটা সস্তা দামের স্যাণ্ডাল। হেঁট হয়ে প্রণাম করে বলল, "কেমন আছ সতীশদা?"

একটু অবাক্ হলাম। হেসে বললাম, "থাক্ থাক্, প্রণাম করতে হবে না, তার পর তুমি কেমন আছ বল? কেমন দেখছ বল দেশের হালচাল?"

"বড্ড লোক বেড়ে গিয়েছে। অবশ্য তাদের জন্যই জলা-জায়গাগুলোও নতুন চেহারা নিয়েছে। সল্টলেক্ অঞ্চল দেখে তো তাজ্জব বনে গেছি। ইস্কুলে পড়বার সময়ও এখানে শালতি চড়ে ভেড়িতে বেড়াতে গেছি। আর আজ—! কিন্তু এত লোকের খাবার যোগাড় করাই তো একটা বড় সমস্যা। তাই না?"

"যা বলেছ ভাই! এই দেখ না, মাছের দাম কি রকম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। আমি তো দেশ স্বাধীন হবার আগেই খুব সস্তায় একটা জমি কিনেছিলাম সোনারপুরের কাছে, মস্ত একটা পুকুর সমেত। মাছের চারাও ছেড়ে যাচ্ছি বছর বছর। কিন্তু মাছগুলো একদম বাড়ছে না, পুষ্টও হচ্ছে না। অথচ এতদিনে এক-একটার ঢাউস চেহারা হয়ে যাবার কথা। বাঁচছেও না বেশিদিন। চুরিও যায় মাঝে মাঝে, সে জন্য একজন পাহারা দেবার লোকও রাখতে হয়েছে। সেও একটা বাড়তি খরচ।"

"তাই নাকি? তা আপনি আবার কবে যাচ্ছেন ওখানে? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?"

"সে তো ভালো কথা। তাছাড়া তুমি তো আবার একজন জুয়লজিস্ট। মৎস্য-বিজ্ঞানও জানা আছে নিশ্চয় খানিকটা?"

পরদিনই ব্যোমকেশকে নিয়ে আমার সেই এঁদো পুকুরের

পাড়ে হাজির হলাম। হ্যাঁ, এখন ওটাকে আমি এঁদো পুকুরই বলি।

ব্যোমকেশ খুব ভালো করে দেখল। তারপর বলল, "এন্তার জলজ গাছ গজিয়েছে দেখছি!"

বললাম, "পরিষ্কার তো করাই মাঝে মাঝে। কিন্তু ঐ গাছগুলি এ জলে কি যে মধু পেয়েছে কে জানে! কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না। একবার তুললে দু'দিন বাদেই ফের অমর, অক্ষয় হয়ে গজিয়ে ওঠে—রক্তবীজের বংশধর যেন!"

ব্যোমকেশ জলের আরও ধারে গিয়ে গাছগুলোকে আরও ভালো করে দেখতে লাগল—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যায় পর্যবেক্ষণ করা। তারপর হঠাৎ বলে বসল, "পুকুরটা আমাকে কয়েক বছরের জন্য জমা দেবেন সতীশ দা?"

হেসে বললাম, "কোন আপত্তি নেই। ও থেকে তো প্রায় কিছুই পাইনা, উল্টে টাকা ঢালতে হচ্ছে। তুমি যদি কিছু ফলাতে পার দেখ। আমি এমনিই তোমাকে ওটা জমা দিতে রাজী আছি।"

"না না, এমনি দিতে হবে না। যা দস্তুর তা আপনি না নিলে আমিই বা নেব কেন? তবে বলছি যদি এখানে মাছের চাষ ভালো করে করতে পারি, রুই-কাৎলাগুলি যদি বড়সড় হয় যেমনটা হওয়া উচিত, তা হলে বরঞ্চ আমাকে একটা শেয়ার দেবেন তার। পুকুর আমি আবার আপনাকে ফেরৎ দিয়ে দেব কথা দিচ্ছি।"

"বেশ, কাগজে-কলমে লিখে দিচ্ছি।"—বললাম আমি।

এর পর ব্যোমকেশ প্রায় রোজই কলেজ ফেরৎ ওখানে যাওয়া শুরু করল। শেষে দেখা গেল সে আর দিনের বেলায় ওখানে যাচ্ছে না—যাচ্ছে সন্ধ্যার পর। আর একা নয়, যাচ্ছে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে। একটা টেম্পো সে কোথা থেকে যোগাড় করে নিয়েছে—সম্ভবতঃ মাসিক হারে ভাড়া করে। টেম্পোভর্তি বড় বড় লোহার তৈরী কি সব সাজানো —দেখতে অনেকটা ভীমের গদার মত। পুকুরের তলায় গদাযুদ্ধ করবে নাকি ঐ জলজ গাছগুলোর সঙ্গে?

প্রথম প্রথম আমিও একটু খোঁজখবর নিতাম, কৌতূহল ছিল কিনা! শেষে ধীরে ধীরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

দেখতে দেখতে প্রায় বছর তিনেক কেটে গেল, পুকুরের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। হঠাৎ একদিন ব্যোমকেশ এসে হাজির। একেবারে সেই টেম্পো সমেত। টেম্পোর মধ্যে বড় বড় কয়েকটা মাছের ঝুড়ি। প্রত্যেকটির মধ্যে মস্ত বড় বড় কতকগুলো রুই-কাৎলা। ওজনে কোনটাই 20/21 কেজির কম হবে না।

"এই নিন সতীশদা, আপনার পুকুরের মাছ। আজকে গোটা কয়েক দিয়ে গেলাম।"

"সে কি, ঐ পুকুরের মাছ—সত্যি এত বড় হয়েছে? গাছগুলো কি মরে গেছে?

"মরবে কেন, দিব্যি বহাল তবিয়তেই টিকে আছে। কিন্তু তাই বলে মাছগুলোকে আর কাবু করতে পারে নি। অবশ্য ওরা কোন কালেই মাছগুলোকে কাবু করতে চেষ্টা করে নি, সহাবস্থানই চেয়েছিল। ঘটনাচক্রে প্রকৃতির নিয়মেই মাছগুলো বাড়তে পারছিল না। আমি সেই খোদার ওপর খোদকারি করেছি মাত্র।"

"ঠিক বুঝলাম না, একটু বুঝিয়ে বল।"—বললাম আমি।

"ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই না, বুঝিয়ে বললে ইস্কুলের ছেলেরাও হয়তো বুঝবে। আপনি তো জানেন, গাছ তার সবুজ পাতা দিয়ে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নেয় আর শিকড় দিয়ে টেনে নেওয়া জলের সাহায্যে তৈরি করে নিজেদের খাবার কার্বোহাইড্রেট—যা নাকি শ্বেতসার জাতীয় খাবার। আর ঐ সময় তারা বাতাসে ছেড়ে দেয় প্রচুর অক্সিজেন। গাছের পাতায় আছে এক রকম সবুজ কণা—তাকে বলা হয় ক্লোরোফিল। এদের জন্যই গাছের পাতার রঙও সবুজ। এই ক্লোরোফিলেরও এ কাজে একটা বড় ভূমিকা আছে। শুধু তাই নয়, ঐ কার্বোহাইড্রেট তৈরি করার জন্য দরকার হয় বেশ খানিকটা শক্তি বা এনার্জি। এই এনার্জি গাছ নেয় সূর্যের আলো থেকে। ইংরেজীতে এই সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফোটোসিন্থেসিস। ফোটো হচ্ছে আলো, আর সিন্থেসিস্ হচ্ছে ভালো বাংলায় সংশ্লেষ অর্থাৎ একত্র মিশে গড়ে ওঠা। তাই ওকে বাংলা করে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ। গাছ ছাড়া মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীরা কিন্তু এভাবে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে পারে না, অথচ শরীর রক্ষা করতে হলে, শরীরের তাপ ঠিক রাখতে হলে কার্বোহাইড্রেট তার চাই-ই। তাই তারা ঐ কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করে গাছের ভিতর থেকেই। নিরামিষভোজী প্রাণীদের তো এ ব্যাপারে কোন অসুবিধাই নেই, মাংসাশী প্রাণীরা আবার ঐ সব নিরামিষ-ভোজী প্রাণীদের খেয়ে তাদের শরীর থেকে তাদের প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করে নেয়। তা হলে বুঝতেই পারছ ফোটোসিন্থেসিস্ এই সব গাছগুলোকে চালিয়ে যেতেই হবে—নিজেদের জন্যও, আবার জীব জগতের জন্যও।

"কিন্তু রাত্রিবেলা? তখন তো আর সূর্যের আলো থাকে না, তাই এই ফোটোসিন্থেসিস্ও বন্ধ থাকে সারা রাত্রি।

"এবার মাছেদের কথায় আসি। শ্বাসকার্যের জন্য সব প্রাণীরই অক্সিজেন দরকার। ডাঙ্গার প্রাণীদের তো বটেই, জলচর প্রাণীদেরও। আমরা ডাঙ্গার প্রাণীরা সোজাসুজি বাতাস থেকেই এই অক্সিজেন টেনে নিতে পারি ফুসফুসের সাহায্যে। কিন্তু জলচর মাছেরা জলের তলায় থাকে বলে

ঐ সুবিধে তাদের নেই। কিন্তু বাতাসের এই অক্সিজেন জলেও গুলে থাকে খানিকটা। মাছেরা তাদের কানকো দিয়ে সেই অক্সিজেন টেনে নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। জলজ গাছ দিনের বেলা যে অক্সিজেন ছাড়ে তারও খানিকটা জলে মিশে থেকে মাছকে তার দরকার মত অক্সিজেন যোগাতে পারে। তবুও রাত্রিবেলা ওদের অক্সিজেনের কিছুটা টান পড়েই। তার ওপর আরও একটা ব্যাপার আছে। জলজ গাছ জলে থাকলেও, তারাও তো জড় নয়, প্রাণীর মধ্যেই পড়ে তারা। তাই তাদেরও শ্বাসকার্য চালাতে হয় ঐ অক্সিজেন নিয়ে। ফলে মাছের অক্সিজেনের ভাণ্ডারে আরও খানিকটা টান পড়ে। এমনিতে তো রাত্রে জলজ গাছেরা তাদের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন জলে মেশাতে পারছে না, উপরন্তু জলে থাকে বলে জলে গোলা অক্সিজেন তাদেরও খানিকটা ব্যবহার করতে হয় নিজেদের শ্বাসকার্য চালাবার জন্য।" এই পর্যন্ত বলে ব্যোমকেশ একটু চুপ করল।

আমি ইস্কুলের ছাত্রের মতই তার এই জ্ঞানদান শুনে যাচ্ছিলাম। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার ছেলেবেলায় খানিকটা পড়েছি কিংবা শুনেছি—কারণ আমাদের কালে তো ইস্কুলে ওসব বিজ্ঞানটিজ্ঞান পড়ানো হ'ত না। কিন্তু এখন প্রায় ভুলে মেরে দিয়েছি।

ব্যোমকেশ বুঝতে পারল বোধ হয়। হেসে বলল "তা হলে বুঝতে পারছেন বোধ হয় আপনার মাছেরা জলের তলায় কেন বড় হচ্ছিল না, ঠিকমত পুষ্ট হচ্ছিল না, আবার কিছু কিছু মরেও যাচ্ছিল। এসবই হচ্ছিল বেচারাদের যতটা অক্সিজেন দরকার তার সবটা না পাওয়ার দরুণই। তাই আমি রোজ রাত্রে টেম্পো বোঝাই করে কতকগুলি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোহার তৈরি ভীমের গদার মত দেখতে ওগুলিই তো অক্সিজেন সিলিণ্ডার। ওর মধ্যে খুব চাপে অক্সিজেন ভরা থাকে। রাতে আমি আপনার ঐ এঁদো পুকুরের জলে ঐ অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে প্রচণ্ড চাপের অক্সিজেন ছেড়ে দিতাম। এ কাজে ছাত্ররা আমায় সাহায্য করত। অবশ্য অক্সিজেনের বদলে খুব চাপ দেওয়া বাতাস যাকে বলা হয় "কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার-"তা দিলেও হয়তো খানিকটা কাজ হ'ত, সস্তাও হ'ত। কিন্তু ঐ বাতাসে তো মাত্র শতকরা 20/21 ভাগ অক্সিজেন থাকে, বাদ বাকি সবটাই নাইট্রোজেন। সে নাইট্রোজেন এখানে কোন কাজে লাগে না। গাছেরা তাদের শরীরে বানিয়ে নেয়। এই প্রোটিন বানাবার জন্য নাইট্রোজেনও তারা ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু সে নাইট্রোজেন ওরা বাতাস থেকে নিতে পারে না, পারে শিকড় দিয়ে টানা রসের মধ্যে যে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ আছে তাই থেকে। আমরা, প্রাণীরা কিন্তু এই প্রোটিনও বানাতে পারি না, ওর জন্যও আমাদের গাছের ওপরই নির্ভর করতে হয় ঐ কার্বোহাইড্রেটের মতই।

প্রচণ্ড চাপের অক্সিজেন ছেড়ে দিতাম......

যাই হোক আমার ঐ অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে চাপ দেওয়া অক্সিজেনে আপনার এঁদো পুকুরের জলও রাত্রিতে অক্সিজেনে ভরপুর হয়ে যেত। ফলে মাছের বাচ্চারা সারাদিন সারারাত তাদের দরকার মত অক্সিজেন নিয়মিত পেতে লাগল আর সেই অক্সিজেনই এদের তরতর করে বেড়ে যেতে সাহায্য করল, পুষ্ট করতে লাগল এবং অকালমৃত্যু থেকেও ওদেরকে বাঁচাল। এই ভাবেই আমি আপনার মাছগুলোকে ঐ রকম ঢাউস আর হৃষ্টপুষ্ট করে তুলতে পেরেছি এই কয়েক বছরে। কোন ম্যাজিকট্যাজিক নেই এর মধ্যে, তার বদলে আছে বিজ্ঞানের একটা সাধারণ ব্যাপারকে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লাগানো। আর তা বোধ হয় পেরেছি, তাই না ?"

কলকাতাতেই থাকি আর যেখানেই থাকি, বাঙ্গাল হিসেবে আমার মৎস্য কালচার ব্যোমকেশের বুদ্ধির কাছে থিতিয়ে পড়ল। আমি অবাক্‌ হয়ে ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দৃষ্টিতে মাখানো ছিল বিস্ময়, আনন্দ আর ওর বুদ্ধির তারিফ। ব্যোমকেশ হয়তো লম্বা বক্তৃতা দিয়ে একটু লজ্জা পাচ্ছিল। সেটা সামলে নিয়ে বলল, "কই, কাউকে ডাকুন। আজ বৌদির হাতের মাছের রান্না খেয়ে তবে বাড়ি যাব। তা সে মাছভাজা; মাছের কালিয়া, মাছের চপ, ঝাল, ঝোল, অম্বল যাই হোক না কেন!" বলেই সশব্দে হেসে উঠল।

16, টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা-700025।

বোর্নিওর বেরী

সঙ্কর্ষণ রায়

॥ এক ॥

কাঁচের স্লাইডে (Slide) ক্যানাডা ব্যালসম-এর (Canada Balsam) আঠায় কয়েকটি ধুলোর নমুনা তুলে নিচ্ছে সুবীর। তার মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে পুলিশ ইনস্পেক্টার মহারাজপুরম ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'ও কি হচ্ছে ডক্টর সিন্‌হা? মৃতদেহ থেকে ধুলো টেনে নিচ্ছেন কেন?

ধুলো পরীক্ষা করব। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখব, খুনীর হদিস ধুলোর মধ্যে পাওয়া যায় কিনা।

'আপনারা বৈজ্ঞানিকরা সত্যিই এক একটা আজব চিজ্। ধুলোর মধ্যে খোঁজার দরকার কি? খুনীকে তো পাশের ঘরেই পেলাম আমরা। গত রত্রে এই ফ্ল্যাটে পুরুষোত্তম প্যাটেলের সঙ্গে ইনি ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। পুরুষোত্তমের চাকরটি ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী আছেন বম্বেতে, ইনি গতকাল সন্ধ্যায় দুপুর থেকে এসেছেন এখানে। পেশায় পুরুষোত্তমের মত ইনিও রত্ন ব্যবসায়ী। ব্যবসা করতে এসে খুন করে বসেছেন। রাত প্রায় বারোটার সময় পুরুষোত্তমের বিকট আর্তনাদ শুনে থানায় ফোন করেন পাশের ফ্ল্যাটের লীলাবতী রঙ্গনাথন। তাঁর টেলিফোন পেয়েই ছুটে আসি আমরা। আমরা কলিং বেল টিপতে ইনিই দরজা খুলে দেন ...

'ইনিই যদি খুনী হবেন তো দরজা খুলে দেবেন কেন! খুনীরা তো সাধারণত খুন করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তা না ক'রে খুন হওয়া পুরুষোত্তমের পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, আপনারা, কলিং বাজাবার পরই ওঁর ঘুম ভাঙ্গে, তাই না?

'তাই তো বলছিলেন ইনি। পুরুষোত্তমের আর্তনাদ নাকি তাঁর কানেও যায়নি। পাশের ফ্ল্যাটের লীলাবতীর কানে গেল, অথচ ওঁর কানে গেল না, রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিঃসন্দেহে ইনিই খুনী, ধুলোর নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই।

'দরকার অবশ্যই আছে, কারণ মৃতদেহে হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ নেই, আছে এই ধুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে...'

বলতে বলতে কাঁচের স্লাইডে আরও কয়েকটি ধুলোর নমুনা তুলে নিল সুবীর। ঘরের মেঝের ওপরে পড়ে ছিল পুরুষোত্তমের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ, সর্বাঙ্গে আঘাত ও ক্ষত চিহ্ন। ক্ষত চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে করতে ভেঙ্কটরাজন বললেন, 'এগুলো ছুরির আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। খুনী প্রথমে এলোপাথারি ছুরি চালিয়েছে, তারপর গলা টিপে ধরেছে...'

'গলা টিপে ধরে থাকলে গলায় আঙুলের ছাপ পড়া উচিত। কিন্তু তার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

'খুনী নিশ্চয়ই দু'হাতে দস্তানা প'রে নিয়েছিল।'

'কিন্তু কোথায় দস্তানা! ইনি তো খালি হাতেই বসে আছেন।

'লুকিয়ে ফেলেছেন বোধ হয়। দাঁড়ান জিজ্ঞাসা করে দেখি...

বলে ভেঙ্কটরাজন এগিয়ে গেলেন হাতকড়া দিয়ে দু'হাত বাঁধা ছোটখাট নিরীহ গোবেচারির মত মানুষটির দিকে। তাঁর, মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, এই যে, কি যেন নাম আপনার...'

'কোদাভতিঘণ্টি বীর বরাহ লক্ষ্মীনরসিংহ মূর্তি।' মুখ নিচু ক'রে মানুটি জবাব দিলেন।

'কি সর্বনাশ।' সুবীর আঁৎকে উঠল: 'এত বিশাল আপনার নাম। শুনে মনে হচ্ছে যেন চার পাঁচ জনের নাম।'

'আমারই নাম।' ক্ষীণস্বরে বললেন মানুষটি, 'আমার নামের মধ্যে অবশ্য বাপ ঠাকুর্দার নাম ও গোত্রও রয়েছে।'

'নামে, কি এসে যায়!' 'ভেঙ্কটরাজন ধমকের সুরে বললেন, 'বলুন, মিস্টার নরসিংহ মূর্তি, কোথায় আপনার দস্তানা ?'

'নেই।' নরসিংহ মূর্তি জবাব দিলেন, 'ছিলও না কখনো।'

'দস্তানা না থাকলে মৃতদেহের বিভিন্ন জায়গায় আঙুলের ছাপ থাকা উচিত।'

'আমার হাতে দস্তানা না থাকলে খুনীর হাতে থাকতে পারে। খুনীকে খুঁজে বের করুন, দস্তানাও পেয়ে যাবেন।'

'খুনী তো আপনি।'

'না আমি খুনী নই।'

'কিন্তু পুরুষোত্তম প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর এই ফ্ল্যাটে আপনি ছাড়া আর কেউই থাকে নি।

ঠিকই বলেছেন। কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম, পুরুষোত্তমের চিৎকার আমার কানেও আসে নি....'

'মিথ্যা কথা। অমন বিকট মরণ—আর্তনাদ আপনার কানে আসে নি, এ হতেই পারে না। মিথ্যা কথা আমি কখনোই বলি না, ঘুম আমার ভাঙ্গে নি।'

ইতি মধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছিলেন পাশের ফ্ল্যাটের লীলাবতী রঙ্গনাথন। মধ্য বয়সী এই মহিলা নরসিংহমূর্তির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন নরসিংহমূর্তি।

উনি মিথ্যা কথা বলেন না। আমি ওঁকে বহু বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও জানি, মাঝে মাঝে উনি আমাদের ফ্ল্যাটেও থেকেছেন। শুনুন মিস্টার ভেঙ্কটরাজন, সম্পূর্ণ একজন নির্দোষ মানুষকে ধরেছেন আপনি। মানুষ খুন করার মত সাংঘাতিক কাজ ওঁর দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত মারতে পারেন না, এমন নরম ওঁর মন...

'আপনি যাই বলুন মিসেস রঙ্গনাথন মিস্টার প্যাটেল যখন খুন হলেন তখন এই নরসিংহমূর্তি ছাড়া আর কেউই ছিলেন না এই ফ্ল্যাটে। আপনি তো মাঝরাত্রে প্যাটেলের মৃত্যু-আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন, তাই না ? ভেঙ্কটরাজন প্রশ্ন করলেন।

'প্যাটেলের মৃত্যু-আর্তনাদ কি না বলতে পারব না, একটা আর্তনাদ আমার কানে এসেছিল।' লীলাবতী জবাব দিলেন, 'আওয়াজটা এই ফ্ল্যাটের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেও ফ্ল্যাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে আমার মনে হয়েছিল শব্দটা যেন ফ্ল্যাটের পেছনের বারান্দা থেকে আসছে।'

'তার মানে পুরুষোত্তম প্যাটেল আত্মরক্ষার জন্য ছোটা-ছুটি করছিলেন। খুবই বীভৎসভাবে ওঁকে খুন করেছেন নরসিংহমূর্তি, মূর্তিমান নৃসিংহ অবতার হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে হচ্ছে...

'না না।' আর্ত স্বরে বলে ওঠেন নরসিংহমূর্তি 'উনি আমার বন্ধু, বহুদিন ধ'রে ও'র সঙ্গে আমার কাজ-কারবার।

লীলাবতী বললেন. ঠিকই বলেছেন নরসিংহমূর্তি, যাকে বলে হরিহর আত্মা তাই ছিলেন ও'রা দুজনে। পুরুষোত্তমের এই কারবার নরসিংহমূর্তির সাহায্য বিনা এতখানি ফেঁপে ফুলে উঠতে পারত না। নরসিংহমূর্তি, তুমি নিজের মুখে বল, পুরুষোত্তমের কারবারে কি কি তোমার অবদান।

ম্লান হেসে নরসিংহমূর্তি বললেন, 'এ সব কথা বলে আর লাভ কি! এ সব কথা হয়তো আমার বিরুদ্ধেই যাবে, খুনের মামলার ফাঁদে আমাকে আরও ভালভাবে জড়িয়ে দেবে। আচ্ছা, লীলাদি, পুরুষোত্তম ও আমি তো আপনাকে আমাদের দিদির মত শ্রদ্ধাভক্তি করি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সোজাসুজি পুলিসকে লেলিয়ে দিলেন!

'লেলিয়ে দেব কেন, খবর দিয়েছি শুধু।' লীলাবতী ঢোঁক গিলে বললেন, ওরকম বিকট আর্তনাদ শুনে মনে হল পুরুষোত্তম বিপদে পড়েছে তাই ...

'পুলিশকে খবর দেওয়ার আগে একবার এখানে এসে দেখে যেতে পারতেন না কি হয়েছে! নিজে আসতে না পারেন আপনার ছেলেকে পাঠাতে পারতেন।'

'আমি কি আর জানি যে তুমি আছ এখানে। অন্যান্য বারের মত তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা কর নি। যদি জানতাম যে পুরুষোত্তমের সঙ্গে তুমি আছ, তা' হ'লে কি সোজাসুজি পুলিশকে খবর দিই!'

খুবই ফুলিশ কাজ করেছেন পুলিশকে খবর দিয়ে।'

'একটুও ফুলিশ কাজ করেন নি মিসেস রঙ্গনাথন।' সুবীর গম্ভীর মুখে বলল, পুলিশকে খবর না দেওয়াই ফুলিশ হ'ত ও'র পক্ষে। এ রকম বীভৎস একটা হত্যাকাণ্ডে পুলিশের তদন্ত তো অপরিহার্য। শুনুন মিষ্টার কোদাভাতি-ঘণ্টি বীর বরাহ লক্ষ্মীনরসিংহমূর্তি, পুরুষোত্তম, প্যাটেলের কাছে কি কাজে এসেছিলেন আপনি ?'

'ব্যবসায়িক কাজে।' নরসিংমূর্তি জবাব দিলেন, 'একটা বড়ো সাইজের হীরে আমি সুরাটের হীরের বাজার থেকে কিনেছিলাম, সে টা দিতে এসেছিলাম তাঁকে। বাজারে তার যা দাম তার চে য় বেশি দামে তিনি তাকে একজন বিদেশীর কাছে বিক্রী করে দেবেন বলেছিলেন।'

'দিতে এসে ছিলেন বলছেন, দিয়েছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ। এসেই দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর সিন্দুকের মধ্যে ওটা রেখে দিয়েছিলেন। গতকাল সকালে এসে গেলেন সেই বিদেশী। হীরেটা পুরুষোত্তমের কাছ থেকে

ঘরের মেঝের উপর পড়েছিল পুরুষোত্তমের মৃতদেহ......

নেওয়ার আগেই তার দাম এবং তার দরুণ কমিশন দিয়ে দিলেন তিনি। বাজার দরের অন্ততঃ আড়াই গুণ পেয়ে গেলাম আমি। পুরুষোত্তমও পেয়ে গেলেন মোটা অঙ্কের দালালি।

'তারপর হীরেটা নিয়ে তিনি চলে গেলেন, তাই না ?'

'নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করবেন বলে হীরেটা গতকাল সকালে তিনি নিতে পারেন নি। পুরুষোত্তমকে বললেন যে রাত্রে আসবেন ওটা নিতে। তাই এলেন। তখন আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রে তাঁর আসা বা হীরেটা নিয়ে চলে যাওয়া কিছুই আমি টের পাই নি।'

'হীরেটা সত্যিই তিনি নিয়েছেন কি না তা' পুরুষোত্তমের কাছে জানতে চাও নি ? ভেঙ্কটরাজন প্রশ্ন করলেন।

'না।' নরসিংহমূর্তি জবাব দিলেন, 'জানবার সুযোগ আমার হয় নি।'

নরসিংহমূর্তির মুখের পানে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভেঙ্কটরাজন বললেন, আমার ধারণা হীরেটা তিনি নিয়ে যাননি। রাত্রিবেলায় ওরকম একটা দামী হীরে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় বলে ওটা তিনি পুরুষোত্তমের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। আর তুমি ঐ হীরেটাকে আত্মসাৎ করার জন্য পুরুষোত্তমকে....

'সব আপনার কল্পনা।' সুবীর বাধা দিয়ে বললে, 'নরসিংহমূর্তিকে সার্চ করে তো কিছুই পান নি।'

'পাচার করে দিয়েছেন বলেই পাই নি।' ভেঙ্কটরাজন বললেন, আমার অনুমান এই বিদেশী ভদ্রলোকটি যে কোনও মুহূর্তে চলে আসবেন হীরেটির জন্য...

সুবীর বললে, কে এই বিদেশী ভদ্রলোক ? কি তাঁর পরিচয় ? মিস্টার নরসিংহমূর্তি, বলুন কি জানেন আপনি তাঁর সম্বন্ধে ?

'তাঁর নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না।' নরসিংহমূর্তি জবাব দিলেন, 'ডক্টর হানৃজ্ হার্টিজ !

'ডক্টর হার্টিজ !' সুবীর উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল, 'বিখ্যাত জীবন বিজ্ঞানী। আজ সকাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, একটু আগে চলে গিয়েছেন তাঁর ম্যাটাডর ভ্যানে করে...

[চলবে]

ছড়া

আতঙ্ক

সুমিত্রা খাঁ

নদীতীরে গড়ে ওঠা যত কলকারখানা
কি আতঙ্ক হানছে দেশে সে তোমরা জান না।
বিভিন্ন কারখানার বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থ
নদীতীরে বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে স্তূপীকৃত।
সেই স্তূপ ক্রমান্বয়ে জল বাহিত হয়।
নদীতীরে তবু কিছুটা বাকি পড়ে রয়
এইভাবে দিনে দিনে নদী বক্ষে থরে
দূষিত হয়েই চলে সকলের অগোচরে।
নদীতীরে গড়ে ওঠা ক্ষেত খামার যত,
সবুজ সতেজ হলেও হয় না দূষণ মুক্ত।
তৃণভোজী প্রাণীকুলে তৃণভক্ষণে
ক্রমে ক্রমে আঘাত হানে 'খাদ্যশৃঙ্খলে'।
পরিশেষে মানব সমাজে আতঙ্ক জাগে,
'দূষণ মুক্ত কর' আজ সকলের আগে॥

লেসার

কমল চক্রবর্তী

নানান রঙে আলোক দেখে
চমকে যদি যাই,
কার যে আছে শক্তি বেশি
বুঝতে পারি নাই।
সবার বেশি শক্তি ধরে
ষ্টীলকে করে গর্ত
প্লেন বা রকেট পালায় যদি
আলোক ফুঁড়ে ধরত।
যে আলোক ধ্বংস করে
নাম কি হবে তার ?
শক্তি তার বড় বেশি
বলে সবে লেসার।

যোগাযোগ

বৈদ্যনাথ দত্ত রায়

হ্যালো—
শুনতে কি পাও
আমি বলছি তোমার মেয়ে আলো।
হ্যালো—
বলছি আমি
তোমার বাবা
মহাশূন্যের ঘরে জ্বলছে আলো।
হ্যালো—
দেখতে কি পাও করছি কিছু ?
হ্যালো—
তুমি খাচ্ছো
আম ও লিচু।

বেতার যন্ত্রের জন্মকথা

ননীগোপাল মণ্ডল

এটা ইলেকট্রনিক্সের যুগ। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এই ইলেকট্রনিক্স আমাদের জন্য কাজ করে চলেছে। আমরা বিজ্ঞানের এই সফলতর যুগের বাসীন্দা বলে নিজেরা গর্ব অনুভব করি। এই মুহূর্তে যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, 'বলুন তো গ্রাম-গঞ্জ-শহর-নগর-বন্দর, আমাদের দেশের যে কোন জায়গায় সমান ভাবে এবং ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সব বাড়িতে ইলেকট্রনিক্সের কোন যন্ত্রটির ব্যবহার সর্বাধিক? কোন রকম জটিল চিন্তা ভাবনা না করে, কোন পরিসংখ্যান তথ্য না নিয়ে নির্দ্বিধায় এর উত্তর দিতে পারবেন এবং তা নিশ্চয়ই হবে "রেডিও সেট"।

ইলেকট্রনিক্সের অভাবনীয় আবিস্কার সমূহের মধ্যে এই রেডিও সেট এত জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে কারনও একাধিক। বর্তমানে এটি সুলভ মূল্যে সর্বত্র পাওয়া যায়। আবার এর রক্ষনাবেক্ষন, মেরামতি এবং ব্যবহার খরচও খুবই কম। আমাদের মতো একটা গরীব দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক দিকটা বেশ ভালোই প্রভাব পড়ে। দামের তুলনায় অনেক দূরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর পৌঁছে দেয় এক নিমেষে। খবর ছাড়াও গান-বাজনা-আবৃতি-নাটক-খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্ত-রঞ্জন করে। অপর দিকে শরীর-স্বাস্থ্য, কৃষি-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান দান করে। এটির মাধ্যমে আমরা ব্যবসায়ীক প্রচার ও সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পারি। সবচেয়ে যে কারনে রেডিও সেট জনপ্রিয় বেশী তা হল বিদ্যুতের ব্যবহার। সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ না থাকলেও মাত্র কয়েকটা (2টি, 3টি, 4টি বা 6টি) ব্যাটারীর (ড্রাই সেল) সাহায্যে এই রেডিও বাজানো যায় এবং সহজে এক স্থান থেকে অপর স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।

এ হেন রেডিও সেট কিন্তু একদিনে আবিস্কার হয়নি। অনেক অনেক বছর ধরে অনেক বড় বড় মাথা একনাগাড়ে কাজ করার পর আমরা আজকের এই রেডিও সেট পেয়েছি, এই রেডিও সেট বা বেতার যন্ত্র সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারা শুরু হয়েছিল অনেক বছর পূর্বে। বেদ-পুরাণ-উপনিষদের বিভিন্ন কাহিনীর সঙ্গে 'দৈববাণী' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। দেখা যায় নীবিড় নিভৃত জঙ্গলে বা সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে বা নির্জন দ্বীপে অথবা আরও কোন জনহীন-স্থানে 'দৈববাণী' শোনা যাচ্ছে। বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় ঐ দৈববাণী কোন অশরীরীর দ্বারা সৃষ্ট। যে যাই বলুন না কেন ঐ বিতর্কে না গিয়ে একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা যায় যে আজ থেকে হাজার বছর আগেও মানুষ বেতারে বা বীনা তারে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় শব্দ পাঠানোর কথা চিন্তা ভাবনা করেছিল। সেই চিন্তা ভাবনার বা কল্পনার বাস্তব রূপ দিয়েছে আজকের এই বিজ্ঞান।

বেতার যন্ত্রের জন্ম কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের (Jems Clark Maxwell) কথা। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ এবং তৎকালীন যুগে এক নামকরা গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদ। 1865 খ্রীষ্টাব্দে তিনি অংক কষে বলে দেন আলোর ন্যায় বিদ্যুৎ শক্তিও তরঙ্গের আকারে আলোর সমান গতিবেগে (1,86,000 মাইল/সেকেণ্ড) প্রবাহিত হয়। তাঁর এই তত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্য চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। সারা বিশ্বের বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। অবশেষে প্রায় একুশ বছর পর 1887 সালে একজন জার্মান বিজ্ঞানী সফল হলেন, তাঁর নাম হাইন্‌রিক হার্ট্‌জ্ (Heinrick Hertz)। হার্ট্‌জ্‌ই বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যিনি বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন করেন। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ তিনি তাঁর প্রেরক যন্ত্র থেকে অদূরে পাঠিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

এরপর নতুন কিছুর আশায় সারা বিশ্বে গবেষণা শুরু হল। এই গবেষণায় যাঁরা আত্ম নিয়োগ করেছেন তাঁরা হলেন স্যার অলিভার লজ, অধ্যাপক পোপোফ, গুগলি-এলমো মার্কোনী, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, ডঃ শিশির কুমার মিত্র ও আরও অনেকে।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বেতার যন্ত্র আবিস্কার করলেও একই সময়ে পরীক্ষামূলক ভাবে এবং মৌলিক গবেষণা করে বেতারকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হল গুগলিএলমো মার্কোনী (Gouglielmo Marconi)। তিনিই শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে 1896 সালে বেতারে শব্দ পাঠালেন। এরপর তিনি চব্বিশ বছর একটানা প্রচেষ্টা চালিয়ে 1920 সালে বিশ্বের প্রথম বেতার প্রচার কেন্দ্র

স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠে ইংল্যাণ্ডের এসেক্স-এর চেমসফোর্ড (Chemsford) নামক স্থানে। এই বেতার প্রচার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে বেতার প্রচার শুরু করেন। এরপরই সারা ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেতার প্রচার কেন্দ্র গড়ে উঠে এবং বেতার প্রচার শুরু হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন দ্রুত গতিতে বেতার প্রচার কেন্দ্র গড়ে উঠছে ভারতও তখন চুপ করে নেই। তৎকালীন ভারতের প্রাণ কেন্দ্র কলকাতায় গড়ে উঠছে 'রেডিও ক্লাব অফ বেঙ্গল। 1924 সালে এই ক্লাবের প্রচেষ্টায় কলকাতা হাইকোর্টের বিপরীত পার্শ্বে টেম্পল চেম্বারের উপরের তলায় একটি ছোট খাট বেতার প্রচার কেন্দ্র গড়ে উঠল। এই কেন্দ্র থেকে রেকর্ডের কিছু গান এবং কিছু সৌখিন গায়কদের গাওয়া গান প্রচারিত হল। একই সময়ে ডঃ শিশির কুমার মিত্র 'কলকাতা সায়েন্স কলেজ' থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে দিলেন। কলকাতাতে বেতার প্রচার নিয়ে যখন এত মাতামাতি ভারতের আর এক শহর মাদ্রাজও এর থেকে বিরত নেই। সেখানেও একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি রেডিও ক্লাব' বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করা আরম্ভ করেছে।

1924 সাল থেকে একটানা তিন বছর পকীক্ষামূলক ভাবে বেতার অনুষ্ঠানের প্রচারের পর 1927 সালে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হল। 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড' নামক এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই বেতার অনুষ্ঠান প্রচারে উদ্যোগী হয়। তারা 1927 সালের 22শে জুলাই বোম্বাইতে এবং একই বছর 26শে আগস্ট কলকাতায় প্রথম দুটি প্রচার কেন্দ্র গড়ে তুলে।

ইণ্ডিরান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির পরিচালনায় বেশ কিছু দিন বেসরকারী ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়ার পর 1930 সালে ভারত সরকার ঐ দুটি (বোম্বাই ও কলকাতা) বেতার প্রচার কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন এবং ঐ পরিচালক প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করেন 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস।' এই নামও বেশিদিন থাকে না। মাত্র ছ'বছর পর 1936 সালে এর নামকরণ হয় "অল ইণ্ডিয়া রেডিও" (A.I.R.)। পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাম দেন 'আকাশবাণী।' 1947 সালে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে বেতার প্রচার কেন্দ্র ছিল সাতটি। বর্তমানে ভারতে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনআশিরও বেশী। অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

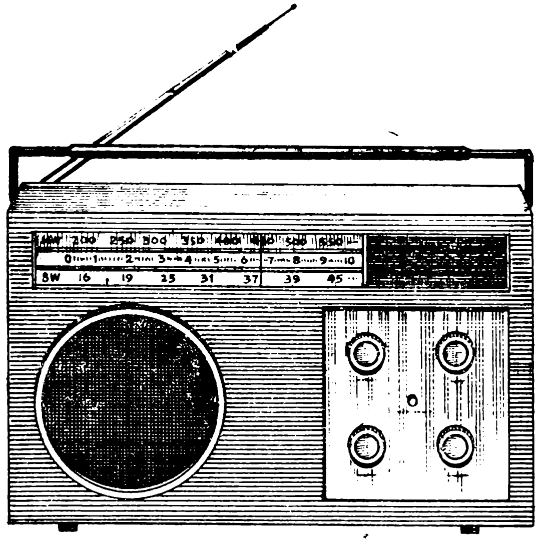

বেতার প্রচার কেন্দ্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও গ্রাহক যন্ত্রের (সংক্ষেপে রেডিও) প্রচলনও বৃদ্ধি পায়। বেতার যন্ত্রের প্রথম পর্বে ক্রিস্ট্যাল রেডিও সেট ব্যবহৃত হত। এতে বড় আকারের এরিয়াল ব্যবহার করা হত অনুষ্ঠান গ্রহণ করার জন্য এবং কানে হেড ফোন লাগাতে হত অনুষ্ঠান শোণার জন্য। এর ফলে একমাত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেউ আর শুনতে পেত না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ডি. সি. বিদ্যুতের সাহায্যে বড় বড় ভাল্‌ভ্‌ ও চোঙ আকারের বড় লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হত। যে সকল অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগান ছিল না সে সকল অঞ্চলে বড় বড় নানা প্রকার মূল্যবান ব্যাটারীর ব্যবহার শুরু হল। এর পর 1948 সালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার হওয়ার ফলে উপরের অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব হল। 1953-54 সালে রেডিওতে ট্রানজিস্টার ব্যবহার শুরু হয় আমাদের দেশে। তারপর অন্যান্য যন্ত্রপাতিও আগের মত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না। তাই স্বভাবতই এর আর্থিকমূল্যও অনেক কম হয়েছে। তাই আজ রেডিও এত জনপ্রিয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ঘরে রেডিও স্থান পাবে। বর্তমানে প্রতি 20টি ঘরের 13টিতে রেডিও তার স্থান করে নিয়েছে।

বামনসরিষা, লালনগর, মেদিনীপুর, পিন-721424।

সাপ যেখানে বন্ধু দীপঙ্কর পাল

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরে একেবারে চারিদিক গাঢ় আঁধারে ঢেকে যাবে। সামনের ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে যে সরু পথ গিয়েছে তা দিয়ে বাড়ি পৌঁছুতে হবে। মনের কোণে একটা চাপা উত্তেজনা মেশানো ভয়। সাধারনতঃ ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড়ে চোর-ডাকাতের ভয় বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সাপের ভয়। সাপ—অর্থাৎ সাক্ষাৎ যম। সাপ দেখলেই হৃৎপিণ্ডে লাফালাফি শুরু হয়ে যায়, আর কামড়ানো মানেই মৃত্যু। এই সময় মনে হয় এই বিশ্বসংসারে পাহীন, চকচকে আঁশওয়ালা, লম্বা দড়ির মতো জীবটি না সৃষ্টি হলেই ভালো হতো। মানুষেরা নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে ঘোরাঘুরি করতে পারত। তার উপর একটা বিষাক্ত জীব এই জীবজগৎ থেকে নির্মূল হলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা নিরাপদে বাঁচতে পারতো।

কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? সাপেরা না থাকলে কি আমরা ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম? সাধারণ ভাবে ব্যাপারটা মাথায় না আসলেও একটু মাথা খাটালে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায়। আসলে সমস্ত সাপকে যদি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদেরকেও বোধ হয় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে। কারণ সাপই আমাদের প্রাণধারণের খাদ্যশষ্য ইঁদুর, খরগোস বা ঐ জাতীয় জীবদের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ইঁদুর নামক প্রাণীটি আমাদের চারপাশে, ঘরে, বা মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। সাপের মতো সরাসরি কোন ক্ষতি করে না বলে খুব ভয়ঙ্কর প্রাণী ভাবা হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইঁদুরের মতো ক্ষতি খুব কম প্রাণীই করে থাকে। সাদামাটা হিসাব থেকে বলা যেতে পারে, ছ'টি মেঠো ইঁদুর একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাওয়া শষ্যদানা খেয়ে ফেলে। এই হারে খাদ্যশষ্য খেতে থাকলে (আর ইঁদুরের দ্রুত বংশবৃদ্ধির হার তো আমরা জানিই) আমাদের মুখের গ্রাস সমস্ত ইঁদুরের পেটেই জমা হবে। এহেন বিপদে আমাদের ত্রানকর্তা যে সাপ, তাদের আমরা বেশির ভাগই ঘৃণা করি, দেখলেই মারমুখী হয়ে দ্রুত যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

ইঁদুর সাপের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এরা ধান-গম ক্ষেতের পাশাপাশি থেকে ইঁদুর দিয়ে লাঞ্চ্-ডিনার সেরে থাকে। আমেরিকায় র‍্যাট্‌ল সাপও শষ্যক্ষেত্রের ক্ষতিকারক প্রাণী খরগোশ, কাঠবিড়ালী এসব খেয়ে শষ্যক্ষেত্রের রক্ষক হিসাবে কাজ করে।

ইঁদুর 'জীবনে' ও 'মরনে' দুক্ষেত্রেই অপকার করে। সারা জীবনে খাদ্যশষ্য নষ্ট করে যদি সে আবার প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে তবে সেই প্লেগের মাছি মানুষের দেহে রোগ ছড়ায়। 1898 সাল থেকে 1948 সাল পর্যন্ত্য গড়ে প্রতিবছর প্লেগ রোগে মরেছে 2,47,015 জন মানুষ। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! সাপের কামড়ে কোনদিন এরকম ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। বোম্বাই শহরে এই সময় প্লেগে হাসপাতালে প্রতি বৎসর রোগী ভর্তি হয়েছিল গড়ে 20,000 জন, অপরদিকে সাপের কামড়ের এই রোগীর সংখ্যা মাত্র 4 জন। ইঁদুরের মতো এরকম সাংঘাতিক প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের সাপেদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

অনেক অভিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, "সাপের বিষে যত লোক মরে, বাঁচে তার থেকে অনেক বেশি"। কথাটা অনেকের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কিন্তু এটা হাড়ে হাড়ে সত্যি। আর বিষাক্ত সাপে কামড়ালেই তো মানুষ মরে যায় না বরং পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে বিষাক্ত সাপে কামড়েছে এমন 100 জনের মধ্যে মাত্র 6-7 জন মারা যায়। সাপের বিষ প্রাথমিক ভাবে বিষ নিষ্ক্রিয় করণের কাজে লাগে। তাছাড়া সাপের বিষ বিভিন্ন ব্যথা-যন্ত্রণা, বিশেষ করে পেশীর যন্ত্রণা উপশমে ব্যবহার করা হয়। সাপেদের বিষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোখুরা বা কোবরার বিষ। মিউরাল লেপ্রসিতে (Meural leprosy) যারা আক্রান্ত তাদের দাওয়াই গোখ্‌রো সাপের ইনডোক্‌শান। তাছাড়া স্নায়ুর বহুদিনের ব্যাথাতেও এটা খুব উপযোগী। আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ক্যানসার, নিউরালজিয়া, নার্ভলেপ্রসি ইত্যাদি ব্যথা যন্ত্রণার উপশম হয় কোবরার বিষে। এই বিষের এক বিশেষ সুবিধা হল এটা ব্রেনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে কখনও ছড়িয়ে পড়ে না।

আমাদের গ্রামবাংলার আর একটি ফনাবিহীন বিষাক্ত সাপ পাওয়া যায়, তার নাম চন্দ্রবোড়া বা রুসেল্‌স্। ভাইপার। চন্দ্রবোড়ার বিষের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দ্রুত জমিয়ে ফেলতে পারে। সেইজন্য এই বিষ বিভিন্ন রকম হেমারেজ বা রক্তক্ষরণের প্রতিষেধক হিসাবে দারুণ উপযোগী।

এই বিষের দ্রবণ দাঁতের ডাক্তাররা হামেশাই ব্যবহার করে থাকেন তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধের দাওয়াই হিসাবে। দেহের ভেতরে যদি আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ হয় তখন ঐ বিষের লঘু

দ্রবণ তৈরী করে পেশীর ভেতরে ইনজেক্শনেরও প্রচলন আছে। হোমিওপ্যাথির ওষুধে সাপের বিষের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। নিউরালজিয়া, সায়াটিক, ল্যারেনজাইটিস্ প্যারালাইসিস্, মেনিনজাইটিস, টিউবারকুলোসিস্ ইত্যাদি রোগে বিভিন্ন সাপের তীব্র বিষ ব্যবহার করা হয়। এমন কি, শুনলে অবাক হতে হয়, ইউন্যানি চিকিৎসাপদ্ধতিতে (Unani system of medicine) সাপের রক্ত লিউকোডার্মা রোগের চিকিৎসাতে কাজে লাগে। আবার যে সাপের বিষের জন্যে মানুষকে কখনও কখনও পরলোকে পাড়ি দিতে হয় সেই বিষ আবার কিছু নেশাখোর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেশার সামগ্রী হিসাবে। সাপের বিষের সাথে আর্সেনিক, কিছু আফিম আর কিছু সুগন্ধী মিশিয়ে এটা তৈরী করা হয়।

ভয়াবহ বিষ থেকে 'জীবনদায়িনী' ওষুধ তৈরি ছাড়াও সাপ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রোজকারেরও সাহায্য করে থাকে। সাপের চামড়া বিদেশের বাজারে দারুন চাহিদা। অনেকে ভাববে, গোল দড়ির মতো তো জীব! কতটুকুই বা চামড়া! কি বা কাজে লাগবে! কিন্তু না, সাপের চামড়া দিয়ে সুন্দর সুন্দর বেল্ট, নেকটাই, ছোট ব্যাগ তৈরি হয়। বিদেশীরা শৌখিন হাতব্যাগ, চিরুনীর খাপ, এমন কি সিগারেটের কেস পর্যন্ত তৈরি করে। প্রতি বছর প্রায় 40-50 লাখ বিভিন্ন রকম সাপের চামড়া ভারত থেকে পাশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানী করা হয়। সাপের চামড়া দিয়ে খেলাধুলার সামগ্রীও তৈরী হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের টুপি, জুতো এসবের ওপর যদি সাপের চমেড়া লাগান হয় তবে সেটা আরও বেশী আকর্ষণীয় ও দামী জিনিসে পরিণত হয়। এছাড়া সাপের চামড়ায় ছুরির হাতল বা খাপ, বই বাঁধানো এসব তো হয়ই। ব্রাজিলের সাওপাওলোয় এক লাইব্রেরী আছে, সেখানে সমস্ত বই সাপের চামড়া দিয়ে বাঁধান।

সাপের বিষ, ও চামড়ার কার্যকারিতা তো হলো, এবার বাকি থাকল মাংশ। সেটাও যে একেবারে ফেলা যায় তা কিন্তু নয়, এই মানুষই তা সানন্দে খাবার টেবিলে স্থান দিয়ে থাকে। কিছু অংশের মানুষের কাছে কিছু কিছু প্রজাতির সাপ খাদ্য তালিকার একেবারে সর্বাগ্রে। সাপের মাংশ দিয়ে তারা দারুন রুচিকর খাবার বানায়। আমাদের, যাদের সাপ দেখলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে তাদের কাছে এটা একটা পরমাশ্চর্য। চীন, বার্মা প্রভৃতি দেশে 'পাইথনের সুপ' একটি সুস্বাদু খাবার। এমনকি ইউরোপ-আমেরিকাতেও পাইথন বা অজগর সাপের মাংশের তৈরি খাবার রেস্টো-র্যান্টের মুখরোচক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে অবশ্য কিছু কিছু উপজাতির লোকেরা সাপের মাংস খেয়ে থাকে। খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়া গেলেও জানা গেছে কতকগুলি বন্য উপজাতির লোকেরা সাপের ডিম খেয়ে থাকে। র্যাট স্নেক বা দাঁড়াশ সাপ সাধারণতঃ 60-70টা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো মুরগির ডিমের থেকে খানিকটা বড়োই, খোলাটা পাত্লা, রান্না করে খেতে হয়তো মন্দ লাগে না তাদের।

'সাপ' বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিষাক্ত প্রাণীর ছবি, কিন্তু প্রাণীবিদদের হিসাব অনুসারে 2500 প্রজাতি সাপের মধ্যে মাত্র 250 প্রজাতি বিষধর। বাদবাকি সব নির্বিষ। সবে মিলিয়ে দেখতে গেলে, দেখা যায় কিছু সাপ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে তাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে ক্ষতি করে ঠিকই, তবুও আমাদের পরিবেশে সাপের গুরুত্ব অনেকখানি।

কুকস্ কম্পাউণ্ড, পুরুলিয়া।

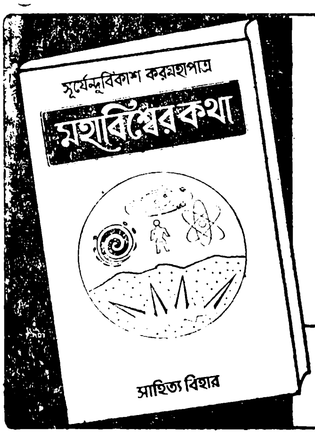

মহাবিশ্বের কথা

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

এই বইতে মহাবিশ্বকে জানতে আদিযুগ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ আছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের পটভূমিকায় মহাজগৎতত্ত্বের আধুনিকতম ধারণাও আলোচিত হয়েছে। Cosmology বা মহাজগৎতত্ত্বে মৌলিককণা ও ক্যুআর্কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এযুগের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মৌলিককণা ও ক্যুআর্ক তত্ত্ব, ক্রোমোডিনামিক্স প্রভৃতি আলোচনা করে লেখক সেই ভূমিকার গুরুত্ব বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। **মূল্য: ২০ টাকা**

প্রকাশক
সাহিত্যবিহার
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট'
অবলম্বনে
যুগের ভিতর যুগ
চিত্রনাট্য - মেনিল কর্মকার
ছবি - গৌতম কর্মকার
লর্ড স্যাগ্রামোর এবার প্রবেশ করলেন রণভূমিতে---
একি, সর্বেসর্বা, আপনার অস্ত্রটি কই?
সামুদ্রিক দৈত্যদের সম্রাটের কাছ থেকে পাওয়া এ নাগপাশ মাত্র আটবারই শত্রুকে পরাস্ত করে। তারপর আপনাআপনিই ফিরে যায় সমুদ্রের তলায়।
কিন্তু সর্বেসর্বা তো তাহলে নিরস্ত্র!
তাতে কি! যে যার অস্ত্র নিয়ে রণক্ষেত্রে আসবে, এই তো ছিল সর্ত। সে অস্ত্র যদি হারিয়ে যায় তাতে প্রতিপক্ষের কী অপরাধ মহারাজ। চলে আসুন স্যাগ্রামোর, আক্রমণ করুন।
এ-এ স্যাগ্রামোর এবার বিপুল বিক্রমে এগিয়ে আসছেন।
দয়া করুন মহারাজ, যুদ্ধ থামান! সর্বেসর্বা নিরস্ত্র।
ওই বর্শাটা এখনি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে স্যার সর্বেসর্বাকে।
সে সুযোগ কিন্তু স্যাগ্রামোর পেলেন না।
গোপন কারখানায় তৈরী আমার পিস্তল আচমকা গর্জন করে উঠলো।
—গুড়ুম...
জিতেছেন-- স্যার সর্বেসর্বা জিতেছেন। লুটিয়ে পড়েছেন লর্ড স্যাগ্রামোর। জয়- সর্বেসর্বার জয়!
37

এবার একের পর এক নাইটের আস্ফালন। বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এলেন তাঁরা। এক--দুই--তিন--চার…গুলী ছুটে চললো একের পর এক…
…গুড়ুম..
নবম নাইটের পতন হোল। আর তিনটে মাত্র গুলী আমার পিস্তলে। তার পর… নাহ, আর ভাবতে পারছি না।
অকস্মাৎ সব চুপ। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ হঠাৎ থেমে গেল। রণক্ষেত্রের উপর ন-নটি নাইটের মৃতদেহ…আর সাহস করার মতো জোর কারও ছিল না। অতএব আর আমার ভয় নেই।
কিন্তু মার্লিন, ওর সঙ্গে কোনও মোকাবিলা তো আজও হোল না। আরও কতো দিন এখনো অপেক্ষা করে থাকতে হবে?
হায়, আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী কি আর কখনও ফিরে পাবো না। ষষ্ঠ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যাবে আমার জীবন?
ঐ-- একের পর এক নাইট ভয়ে পালাচ্ছে।
দুয়ো-- দুয়ো--হেরে গেল! পালিয়ে গেল!
জয় মহাবীর মহাযাদুকর সর্বেসর্বার জয়!
তিন বছর পর… ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্রিটেনে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে তুলে এনে বসিয়েছি। নাইটরা আর নেই। তারা এখন বর্মপরে কাজ করে নানান অফিসে, বাসে, জাহাজে…
38

দাসপ্রথার অবসান হয়েছে। চাষীরাও এখন মনের আনন্দে কাজ করে যায়। জমিদারের অত্যাচার সইতে হয় না। গির্জার দাবীও ওদের উপর নেই। ফলে ক্রুদ্ধ হয়েছেন গির্জার শাসকদল।
তারজন্যে কোনও দুশ্চিন্তা আমার নেই। প্রয়োজন হলে এক একটা গির্জা আমি রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেবো আকাশে।
আক্রমণ কিন্তু প্রত্যাশিত পথ দিয়ে এলো না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার শরীর দিনে দিনে ভেঙে পড়ছিল।
তাই পনেরো দিনের অবসর নিয়ে দক্ষিণ গলে যাত্রা করলাম।
ক্লারেন্সকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। আশা করি ও সামাল দিতে পারবে।
জাহাজ আমায় তীরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। পনেরো দিন পর—
আশ্চর্য! জাহাজ তো আজও এলো না!
গলের রাজার কাছে ছোট্ট একটা জাহাজ ধার নিয়ে সমুদ্রে ভাসলাম। আশ্চর্য, ব্রিটেনের একটি জাহাজও পথে দেখলাম না।
ডোভার থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুটলাম ক্যামেলটের দিকে।
ব্রিটেন কি এই পনেরো দিনের মধ্যেই তার আগের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছে নাকি? সারা পথে একটা সংবাদপত্র পর্যন্ত নজরে এলো না।
ক্যামেলটে অবশেষে পৌঁছলাম—
কী ব্যাপার ক্লারেন্স?
সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার।
39

আপনি তো জানেন, রাণী গুইনিভার শ্রদ্ধা করতেন মহান ল্যান্সলটকে?
জানি ক্লারেন্স।
গির্জার উসকানিতে রাজার ভাইপোরা ঘটনাটাকে রঙ চড়িয়ে রাজার কাছে অভিযোগ আনে।
এবং রাজা তা সমর্থন করেন। তাই না ক্লারেন্স?
আপনার অনুমান অভ্রান্ত স্যার।
তারপর?
ল্যান্সলট রুখে দাঁড়ান তাঁর সম্মান রক্ষার জন্যে। তারপর যুদ্ধ! একদিকে সব নামী-অনামী নাইট, অন্য দিকে রাজার সৈন্যদল।
ওহ, একটা সামান্য খবরও যদি পেতাম!
চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি স্যার কিন্তু আমার হাতের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।
রাজা ভালো আছেন তো ক্লারেন্স?
না। যুদ্ধকালে তিনি ভাইপোর হাতে আহত হয়ে মারা গেছেন স্যার।
হায় হতভাগ্য রাজা, আমি শেষরক্ষা করতে পারলাম না। রাজা নেই, কিন্তু এখনো আমি মহামন্ত্রী। এবার যুদ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর গির্জা বনাম উনবিংশ শতাব্দীর এই সর্বেসর্বা।
40

অ্যান্টার্কটিকা

অরুণ কুমার রায়

অজানাকে জানা অচেনাকে চেনা মানুষের এক চিরন্তন প্রবৃত্তি। সে জানার জন্যে সকল বাঁধা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলেছে পৃথিবীর গণ্ডি ছেড়ে মহাকাশে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। 'অ্যান্টার্কটিকা' পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত এক রহস্য ঘেরা মহাদেশ। তাই এর আকর্ষণ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'অ্যান্টার্কটিকা' পৃথিবীর সব শেষে আবিষ্কৃত মহাদেশ। এর চারিদিকের উত্তাল সমুদ্র একে অন্যান্ন মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ভারতবর্ষ থেকে কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিকার দূরত্ব প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার এবং আয়তন বিশাল, প্রায় এককোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। ভারতের আয়তনের প্রায় চারগুণ। পৃথিবীর প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ বরফ বা মিষ্টিজল এই মহাদেশে রয়েছে। এখানে শীতকালে তাপমাত্রা প্রায় —60 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায়। এবং সব সময় বাতাস ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়। মহাদেশটির গড় উচ্চতা প্রায় দুই হাজার মিটার, এবং সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ এলসওয়ার্থ পর্বতমালার ভিন্‌সন ম্যাশিক্ উচ্চতা 5400 মিটার। এখানে রেকর্ড করা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -88 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক 'বরফের মরুভূমি' (-85°C) এখানে অবস্থিত। অত্যন্ত শুকনো আর ধুলোবিহীন আবহাওয়ার জন্য ঐ মহাদেশে যে কোন অভিযাত্রী স্বাভাবিক আলোয় প্রায় 500 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পাহাড়ের চুঁড়া বেশ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এখানকার অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মেরুজ্যোতি বা, অরোরা আলোর আল্পনা। অবাক লাগে এই যে, এই শীতলতম মহাদেশেও রয়েছে বেশ কয়েকটি জ্যান্ত আর ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের চারিদিকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রচুর ছোট ছোট বরফ খণ্ড। এদের মধ্যে কতকগুলি খুবই ভারী এবং কতকগুলি খুবই হালকা। ভারী বরফখণ্ডগুলি বলা হয়—'পোলিনিয়া'—এদেরকে জল থেকে 45 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ভাসতে দেখা যায় (বরফের প্রায় $\frac{1}{10}$ অংশ জলের উপরে ভাসে)। পাতলা বরফখণ্ডগুলি পদ্ম পাতার মত ভাসতে দেখা যায়। অন্য এক ধরনের বরফ আছে যাদের ভিতর দিয়ে বরফ ভাঙ্গার জাহাজ বরফ কেটে অগ্রসর হতে পারে না—এদেরকে বলা হয় 'ফল্‌স আইস্'। আর ছোট ছোট বরফের টুকরোগুলিকে বলা হয় 'গ্রোলার।'

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোন স্তন্যপায়ী জীব, সরীসৃপ বা উভয়চর প্রাণী চোখে পড়ে না। তবে উপকূলের সমুদ্রে নাইট্রোজেন, কার্বনেট, ফসফরাস, সিলিকা প্রভৃতি খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জাতের জলজ উদ্ভিদ বা ফাইটোপ্লাঙ্কটন জন্মায়। ঐ প্লাঙ্কটন খেয়ে নানা জাতের জলচর জীব, যেমন চিংড়ি মাছের মত দেখতে লাল রং-এর ক্রিল আর ছোট ছোট মাছ বেঁচে থাকে। ক্রিল খুবই প্রোটিন সমৃদ্ধ। আশা করা হচ্ছে পৃথিবীর প্রোটিন চাহিদার এক বিরাট অংশ এই ক্রিল থেকে মেটানো সম্ভব। পৃথিবীর বহু দেশ যেমন জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, বৃটেন - এই মেরুসমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্রিল ধরছে। ক্রিল খেতে একটু দুর্গন্ধযুক্ত বলে এদেরকে খাবারোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করছে। এখন আপাতত ক্রিলকে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখানে প্রচুর পেঙ্গুইন, সুয়া, পেট্রেলগাল, টার্ন প্রভৃতি পাখি এবং সীল, তিমি প্রভৃতি প্রাণী মেরু সমুদ্রে দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে জলচর পাখি। এছাড়া দেখা যায় দুই থেকে তিন টন ওজনের হাতি সীল। মেরুসাগরে দুই-তিন প্রকারের তিমি দেখা যায় যেমন ঃ নীল ও দাত বা বেলিনযুক্ত তিমি। নীল তিমি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী দৈর্ঘে 30 মিটার এবং ওজনে 152 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক একটি তিমি মাছ দিনে প্রায় তিন টন ক্রিল খেয়ে থাকে। এখানে চার ধরনের সীল দেখা যায়। রস সীল, ওয়েদেলসীল, প্র্যাবইটার সীল ও লেপার্ড সীল। এদের মধ্যে লেপার্ডসীল, হল মাংসাসী ও হিংস্র। এদের প্রধান খাবার পেঙ্গুইন। বাকী অন্যান্য জাতে সীল ক্রীল বা অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ খেয়ে থাকে।

তিরিশ অক্ষাংশ পার হলেই দেখা যায় নানা ধরনের পাখির ছড়াছড়ি। এরা জাহাজ থেকে ফেলা খাবারের লোভে পিছন পিছন উড়তে থাকে। এদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণীয় হচ্ছে অ্যালবাট্রস, বিশাল এদের ডানা ছড়িয়ে কখনো সমুদ্রে বা কখনো আকাশে ভেসে বেড়ায় দেখে মনে হয় যেন, গ্লাইডার প্লেনের খেলা হচ্ছে। এদের ডানার দৈর্ঘ

প্রায় তিন মিটার। জাহাজের পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সব পাখি বেশী দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রায়ন (Prion), পেট্রেল, কেপ পায়রা। এদের প্রধান খাদ্য সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ, বা ক্রীল বা স্কুইড জাতীয় প্রাণী।

এই মহাদেশে প্রায় সাত ধরনের পেঙ্গুইন দেখা যায়। এদের মধ্যে এম্পেরর বা সম্রাট পেঙ্গুইন ও এতেলী পেঙ্গুইন বেশি দেখা যায়। পেঙ্গুইনরা পাখী হলেও কিন্তু উড়তে পারে না। মানুষের মতই দুপায়ে হেটে চলাফেরা করে। এদের প্রধান খাদ্য সমুদ্রের ক্রীল কুমেরুর মূল মহাদেশে যে সব পাখি সর্বাধিক বেশি দেখা যায় তা হল বোলো—স্কুয়া। এরা হচ্ছে ঈগল জাতীয় পাখি। অন্যান্য ছোট ছোট পাখি বা পেঙ্গুইনের ডিম বা ছোট বাচ্চা খেয়ে বেঁচে থাকে। স্কুয়া পাখির ডাক অনেকটা হাসের ডাকের অনুরূপ।

ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক সর্বপ্রথম 1773 খ্রীঃ কুমেরু বৃত্ত অভিযান করেন ; কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছতে পারেন নি। 1820 খ্রীঃ পামার অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এর মহাদেশীয় রূপটি আবিষ্কার করেন। তারপর ওয়েভোন (1823), বিস্কো (1831) চার্লস উইকস্ (1838), জেমস্ ক্লার্ক রস (1842) প্রভৃতি দুঃসাহসিক অভিযাত্রীগণ কুমেরু মহাদেশের দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি দেন। শেষ পর্যন্ত 1911 খ্রীঃ 14-ই ডিসেম্বর নরওয়ের অভিযাত্রী রোয়াল আমুরসান দক্ষিণ মেরুর বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সত্ত্বেও প্রথম পদার্পণ করেন। এর পরে কৃতিত্ব অর্জন করেন অপর এক অভিযাত্রী রবার্ট স্কট। এর পর বহুদেশ এই কুমেরু অভিযানে সাফল্য লাভ করে, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম।

বর্তমানে এই দুর্গম মহাদেশে শীতের দিনে প্রায় 800 বিজ্ঞানী এবং গরমের দিনে প্রায় 2000 বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে পৃথিবীর বহু দেশ যেমন : আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, ভারত তাদের নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই কুমেরুকে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যবহারের জন্য বিশ্বের আঠারোটি বিশিষ্ট দেশ 1968 সালে 'অ্যান্টার্কটিকা প্যাক্ট'-এ স্বাক্ষর করে। চুক্তির শর্ত অনেকটা এইরূপ যে—কোন দেশ এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন, সামরিক ঘাটি, বা কোনরূপ সামরিক গবেষণা করতে পারবে না। পৃথিবীর যে কোন দেশ এখানে গবেষণা করার সুযোগ পাবে, এখানকার সম্পদ কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ নয়, পৃথিবীর সকল দেশ এই সম্পদ আহরণ করতে পারবে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ভারতও এগিয়ে চলেছে তাঁর বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে, সেও কুমেরুতে পদার্পণ করে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রথম কুমেরু অভিযান শুরু হয়, 1981 খ্রীঃ থেকে। ঐ বছর 6-ই ডিসেম্বর ডঃ সৈয়দ জহুর কাশিমের নেতৃত্বে 23 জন বিজ্ঞানীর একটি অভিযাত্রী দল নরওয়ের কাছ থেকে ভাড়া করা একখানা ছোট বরফ ভাঙ্গার জাহাজ 'প্রোলার সার্কাল'-এ করে গোমার মার্মাগাঁও বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেন। জাহাজের সাথে একটি ছোট হেলিকপ্টার ছিল নাম 'অ্যালোমেণ্ট'। অভিযাত্রীর মার্মাগাঁও থেকে মরিসাসের 'পোর্ট লুই' হয়ে কুমেরুতে গিয়ে পৌঁছান। অবশ্য প্রথম বারের অভিযাত্রা প্রসঙ্গটি প্রাথমিক পর্যায়ে গোপন রাখা হয়েছিল এবং এর নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন গঙ্গোত্রী'। কুমেরুর ঠাণ্ডা ঝড়ো প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য আগে থেকেই সুদীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল হিমালয়ের 13000 ফুট উপরে লাডাক অঞ্চলের প্রচণ্ড শৈত প্রবাহ ও হিমবাহের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা কুমেরুতে গিয়ে আবহ-বিদ্যা হিমবাহ-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা জীব-বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করেন। সেখানে তারা একটি স্থায়ী ভারতীয় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা

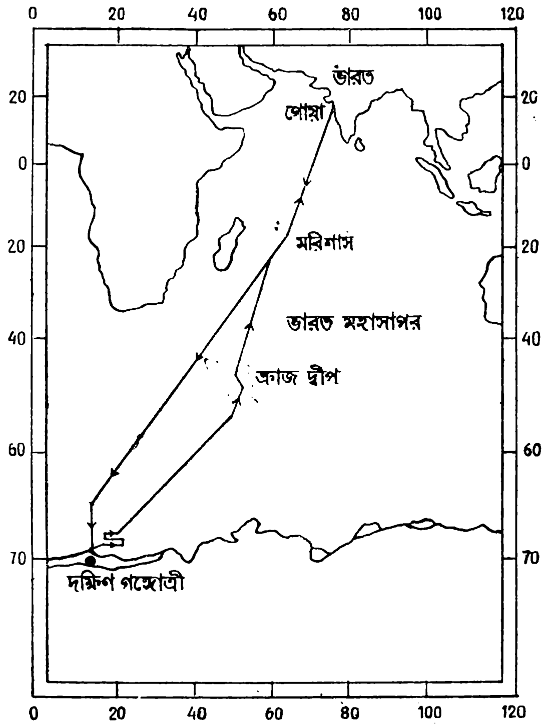

তৃতীয় অভিযানের যাত্রা পথ - গোয়া থেকে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী

গোয়া থেকে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী অ্যান্টার্কটিকা

করেন। সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করে 21শে ফেব্রুয়ারী সাফল্য ও উৎসাহ নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রথম অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীগণ 1982 খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ডঃ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্য একটি বরফভাঙ্গার জাহাজ 'ফিনপোলারিশ'-এ করে দ্বিতীয় অভিযানে রওনা হন। জাহাজটির ধারণ ক্ষমতা পনেরো হাজার টন। এর উপর একটি হেলিপ্যাড ও হেলিকপ্টার ছিল নাম 'প্রতাপ'। দ্বিতীয়, অভিযানে সফল হয়ে এবং গবেষণাকার্য সম্প্রসারণ করে নির্বিঘ্নে অভিযাত্রী-দল দেশে ফিরে এসেছে।

1983 খ্রীঃ ডঃ হর্ষ কুমার গুপ্তের নের্তৃত্বে তৃতীয় অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানে একটি ভারতীয় স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে প্রয়োজনীয় উপাদান, সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি নিয়ে যান এবং সেখানে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই গবেষণা কেন্দ্রের নাম রাখা হয় দক্ষিণ গঙ্গোত্রী (70°45', 11°48') এখানে বারো জন বিজ্ঞানীর একটি দল স্থায়ীভাবে থেকে সমুদ্রবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান ও আয়োনোস্ফিয়ার সংক্রান্ত বহু গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ করেন।

চতুর্থ অভিযান ঃ (1985) ডঃ বি. বি. ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে 25শে জানুয়ারী আমাদের বিজ্ঞানীদল সেখানে গিয়ে পৌঁছান এবং 26শে জানুয়ারী সেখানে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করেন। তারা 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' থেকে 195 কিলোমিটার দক্ষিণে 'মৈত্রী' নামে আর একটি স্টেশন স্থাপন করেন। তারা ভূ-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে দেখেন যে এখানে দস্তা, সীসা, তেল, গ্যাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে।

পঞ্চম অভিযানে ঃ (1985-86) শ্রী কাতিলের নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের একটি দল কুমেরুতে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তারা বিভিন্ন গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেন। পূর্ববর্তী অভিযানে তারা যে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়ার স্টেশন স্থাপন করেছিলেন তার ক্যাসেট থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা বায়ুর বেগ নির্ণয়ের জন্য যে অ্যান্টেনা স্থাপন করেছিলেন তার তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানকার বায়ুর বেগ নির্ণয় করেন। আশ্চর্য যে তৃতীয় অভিযানে 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' নামে যে স্টেশন স্থাপন করেছিলেন প্রচণ্ড বরফের ঝড়ে তার চারিদিকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত বরফে ঢেকে গেছে। তাই বিজ্ঞানী ছাদের উপর দিয়ে ফুটো করে ঐ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে চলেছেন।

কুমেরুতে সব সময় অবিরাম ঝড়ঝঞ্জার প্রতিকুল প্রকৃতিক পরিবেশে খুব সাবধানে বিজ্ঞানীরা চলাফেরা করে থাকেন। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় চালাচলের জন্য 'স্নো স্কোটার'-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এইগুলি হালকা মালপত্র এবং অল্পসংখ্যক লোকজন বহন করতে পারে। সমতলে বরফের উপর দিয়ে মাল বহনের জন্য কুকুরে টানা 'শ্লেজগাড়ি' এবং ভারী মাল বহনের জন্য 'স্নো-ট্রাকটার' ব্যবহার করেন। এইগুলি অসমতল যায়গায় মাল বহনের পক্ষে উপযোগী। প্রচণ্ড ঝড়ের সময় বড় তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যায় বলে তখন তারা ছোট ছোট তাঁবুর নিচে আশ্রয় নেন, এই তাঁবুগুলিতে একসঙ্গে দুই-তিনজন থাকা যায়। রাতে ঘুমোনোর সময় তারা 'শ্লিপিং ব্যাগ'-এ ঘুমিয়ে থাকেন। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় ক্যাম্প তৈরি করে রেখেছেন সেখানে বেশ কয়েকদিনের খাদ্য, ঔষধ পানীয় প্রভৃতি মজুত রাখা আছে। যদি কোন অভিযাত্রী প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হয়ে যায় তবে এই সব আশ্রয় ক্যাম্পে সাময়িক আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে। বিজ্ঞানীরা সব সময় দলবদ্ধভাবে চলাচল করে থাকে কারণ যে কোন মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের কাছে, খাবার, ঔষধ যোগাযোগের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রাখেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র ভূ-পর্যটন এবং ভূ-পরিদর্শনের জন্যই কুমেরু অভিযান করেন নি। তারা ভূ-বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। তারা আবহাওয়া-বিদ্যা পদার্থ-বিদ্যা, সমাজ-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, আয়োনোস্ফিয়ার-বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভারত মহাসাগর ও ভারতবর্ষের উপর কুমেরুর আবহাওয়ার প্রভাব প্রভৃতি সংক্রান্ত গবেষণায় অসমান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আমাদের বিজ্ঞানীরা কুমেরুতে একটি অজ্ঞাত পর্বতের আবিষ্কার করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন 'মাউন্ট ইন্দিরা' কুমেরু অভিযানের অসামান্য সাফল্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পরবর্তী অভিযানে আরও উৎসাহিত করবে।

ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ-পরগণা।

আয়নার ইতিহাস

বাচ্চু মুখার্জী

প্রাত্যাহিক জীবনে আয়না যে আমাদের কত প্রয়োজনীয় বস্তু তা তো আমরা জানি। চলতে ফিরতে এর গুরুত্ব সবসময় আমরা উপলব্ধি করে থাকি। কিন্তু এই আয়না কিভাবে আবিষ্কৃত হল এবং এর নির্মাণ কৌশল কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল তার একটি ইতিহাস আছে।

অনেকদিন আগে যখন কাঁচের আয়না আবিষ্কার হয়নি, লোকে তখন চকচকে পেট মোটা ধাতুর পাত্র দিয়ে আয়নার কাজ চালিয়ে নিত। সাধারণতঃ এগুলো রূপো বা তামা-র সঙ্গে টিন মিশিয়ে তৈরী করা হত।

এক সময় কোন এক ব্যক্তি আবিষ্কার করলেন যে, ধাতুর আয়নার সামনেটা যদি কাঁচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় তবে সেগুলো ততটা কালো হয় না।

এর পরেই হল কাঁচের আয়নার আবিষ্কার।

অনেকদিন পর্যন্ত আয়না তৈরী করার জন্য একখণ্ড কাঁচের উপর একটা টিনের রাংতা মুড়ে দিয়ে তার উপর পারা ঢেলে দেওয়া হত। পারার জন্য টিন গলে কাঁচের গায়ে আটকে থাকত। তারপর যেটুকু পারা বেশি হত সেটুকু গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হত। একাজ করতে বড় বেশি সময় লেগে যেত।

এরপর লিবিগ নামে একজন বিজ্ঞানী একটা ভাল উপায় বের করে ফেললেন। একখণ্ড কাঁচের উপর রূপো মেশানো একটা তরল জিনিস ঢেলে দিলেন। এতে আধঘণ্টার মধ্যেই কাঁচের উপর একটা প্রলেপ পড়ে যায়। এই প্রলেপের ওপর একটা রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হল যাতে রূপোটা নষ্ট না হয়ে যায়।

পৃথিবীর মধ্যে একটিমাত্র শহর ছিল যেখানে আয়না তৈরী হত। শহরটির নাম ভেনিস।

এই ভেনিসের লোকেরা আয়নার নির্মান কৌশল কাউকে জানাত না। ওখানকার আইন-ই ছিল, যে ব্যক্তি কোন বিদেশীর কাছে আয়না তৈরীর পদ্ধতি ফাঁস করে দেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর আয়নাও এখন তৈরী হত মুরানো বলে একটি দ্বীপে।

ভেনিসে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত থাকতেন তাঁর কাছে একটা গোপন চিঠি দিলেন ফরাসী দেশের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী কোলবার্ত। চিঠিতে লেখা ছিল ফরাসীদেশের আয়নার কারখানার জন্য যে করেই হোক কয়েকজন কারিগর চাই।

রাষ্ট্রদূতের মাথায় যেন বাজ পড়ল। কারণ, তিনি জানতেন মুরানো থেকে কোন কারিগরকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ কি। ভেনিসের আইনে তখন স্পষ্টই লেখা ছিল, "যদি কোন কাঁচ শিল্পী অন্য কোন দেশে কাজ নেয় তবে তাকে ফিরে আসতে বলা হবে। যদি সে কথা না শোনে তবে তার আত্মীয়-স্বজনকে কারারুদ্ধ করা হবে। এতেও যদি সে দেশে না ফেরে তবে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে তাকে মেরে ফেলা হবে।"

কিন্তু তাহলেও সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় দেখা গেল একটা নৌকো এসে রাষ্ট্রদূতের বাড়ীর গায়ে থামল। আর কালো পোষাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটা বেঁটে কালো লোক (লোকটি অবশ্য মুরানো দ্বীপের একটা ছোট কাঁচের দোকানের মালিক) রাষ্ট্রদূতের বাড়ীতে ঢুকল। কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার তাকে ফিরতে দেখা দেল। তারপর প্রায় রোজই দেখা যেত এই রহস্যজনক লোকটি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে যেত। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের কাছে কেন এই লোকটির আগমন তা কেউ জানতে পারল না।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে একখানা নৌকা প্রায় কুড়িজন সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে মুরানো দ্বীপে এসে থামল। আর তখুনি অন্ধকার দ্বীপের দিক থেকে ঐ দোকানদারের সঙ্গে চারজন কারিগর এসে ঘাটে দাঁড়াল। তারা নৌকোয় চড়ে বসতেই দাঁড়ের শব্দ করতে করতে নৌকোটি চলে গেল ফ্রান্সের দিকে।

এই চারজনের পালাবার খবর যখন ভেনিসে জানাজানি হয়ে গেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফ্রান্সে তখন এরা কাঁচের আয়না তৈরী আরম্ভ করে ফেলেছে।

তারপর ফ্রান্স থেকে কাঁচের আয়নার নির্মাণ পদ্ধতি পৃথিবীর সব দেশেই আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল।

38, 1নং দেবীগড়, মধ্যম গ্রাম, উত্তর 24-পরগণা-743275

চলন ও গমন / দীপঙ্কর দত্ত

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

1. চলন ও গমন কাকে বলে ?

Ans. বাহ্যিক উদ্দীপকের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোনো জৈবিক কারণে বা কোনো অভ্যন্তরীন তাগিদে একই স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালনের নামলেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে অর্থাৎ চলনের মাধ্যমে স্থানান্তরে যাওয়ার নাম গমন।

2. চলন ও গমনের উদ্দেশ্য কি ?

Ans. চলন ও গমনের উদ্দেশ্য বহুবিধ ঃ—

(i) খাদ্য সংগ্রহ (ii) আত্মরক্ষা (iii) জনন। (iv) পরিমান (v) পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন।

3. চলন ও গমনের পার্থক্য কি ?

Ans. চলন ও গমন একপ্রকার দৈনন্দিন কার্য। উভয়ের ঘটানোর জন্য অঙ্গ সঞ্চালন করতে হয়। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে—

চলন

(i) সংজ্ঞা [ওপরে দেওয়া হয়েছে]।

(ii) একই স্থানে স্থির থেকে চলন সম্ভব।

(iii) চলন, গমনের উপর নির্ভরশীল নয়।

গমন

(i) সংজ্ঞা [ওপরে দেওয়া হয়েছে]।

(ii) একই স্থানে স্থির থেকে গমন সম্ভব নয়।

(iii) গমন সর্বদাই চলনের উপর নির্ভরশীল।

4. গমনে অক্ষম কয়েকটি প্রাণী ও সক্ষম কয়েকটি উদ্ভিদের নাম কর।

Ans. অক্ষম প্রাণী—(i) অ্যাসিডিয়া—(ii) মলগুলা (iii) প্রবাল (iv) স্পঞ্জ।

সক্ষম উদ্ভিদ—(1) কলামাইভোমোনাস। (ii) ভলভক্স। (iii) মিক্সোমাইসেটিস্।

5. উদ্ভিদের গমনকে প্রধানতঃ কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?

Ans. প্রধানতঃ দুটি ভাগে।

(i) সার্মাগ্রক চলন [বা গমন]

(ii) বক্র চলন [বা গমন]

দ্রষ্টব্য ঃ—সামগ্রিক চলনকে সামগ্রিক গমন, এবং বক্র গমনকে বক্র চলন বলাই শ্রেয়।

6. উদ্ভিদের গমনের বা চলনের পর্যায়ক্রমিক ভাগগুলি লিখ।

Ans. (1) সামগ্রিক গমনের দুটি ভাগ।

(A) স্বতঃস্ফূর্ত গমন।

(B) ট্যাক্টিক বা আবিষ্ট গমন।

(A) স্বতঃস্ফূর্ত গমনকে পুনরায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (a) আবদ্ধ কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রবাহ।

(b) নগ্ন কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রবাহ।

(a) আবদ্ধ কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রবাহকে (সাইক্লোসিস) পুনরায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) আবর্তন। [উদাঃ—ভ্যালিসনেরিয়ার কোষে]

(ii) পরিবেষ্টন। [উদাঃ—কুমড়ার রোম কোষে]

(b) নগ্ন কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রবাহের দুটি ভাগ।

(i) অ্যামিবয়েড। [উদাঃ—উদ্ভিদের গ্যামেট কোষে]
(ক্ষণপদ দ্বারা গমন)

(ii) সিলিয়ারি। [উদাঃ—ভলভক্স]
(সিলিয়া দ্বারা গমন)

(B) আবিষ্ট গমন বা ট্যাকটিক গমন ইহাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(i) ফটোট্যাকটিক (আলোক উদ্দীপকের দ্বারা গমন)। [উদাঃ কিছু কিছু এককোষী বা শৈবাল]

(ii) থার্মোট্যাকটিক, বা (উষ্ণতা উদ্দীপকের দ্বারা গমন।) [উদাঃ—পাতাশেওলা উদ্ভিদের পাতার কোষ]

(iii) কেমোট্যাকটিক বা (রসায়ন উদ্দীপকের দ্বারা গমন) [উদাঃ—গ্লুকোজের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মসের শুক্রাণুর ডিম্বাণুর দিকে গমন]

(2) বক্রচলন—

বক্রচলন দুভাগে বিভক্ত।

(i) আবিষ্ট চলন। (ii) স্বতঃস্ফূর্ত চলন।

আবিষ্ট চলনের দুটি ভাগ।

(A) ট্রপিক চলন। (B) ন্যাস্টিক চলন—

(A) ট্রপিক চলনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(a) ফটোট্রপিজম—বা আলোকবর্তী চলন।

(b) জিওট্রপিজম্ বা অভিকর্ষবর্তী চলন।

(c) হাইড্রোট্রপিজম বা জলবর্তী চলন।

এইরূপ চলন সকল উন্নত উদ্ভিদেই দেখা যায়।

(B) ন্যাস্টিক চলনকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়—

a) ফটোন্যাস্টি [উদাঃ—পদ্মফুল]

b) থার্মোন্যাস্টি [উদাঃ—টিউলিপ ফুলে]

c) নিকটিন্যাস্টি [উদাঃ—তেঁতুল গাছের পত্রকে]

d) কেমোন্যাস্টি [উদাঃ—সূর্য শিশিরের কর্ষিকাতে]

e) সিসমোন্যাস্টি [উদাঃ—লজ্জাবতীলতার পাতাতে]

(ii) স্বতঃস্ফূর্ত চলন—

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—

(A) বৃদ্ধিজ চলন। (B) প্রকরণ চলন।

(A) বৃদ্ধিজ চলনের চারিটি ভাগ।

a) বলন—[উদাঃ—বল্লী জাতীয় উদ্ভিদে]

b) পরিবলন—[উদাঃ—লাউগাছের আকর্ষে]

c) হাইপোন্যাস্টি [উদাঃ—নবগঠিত কলাপাতার নিম্নতলে]

d) এপিন্যাস্টি [উদাঃ—নবগঠিত কলাপাতার [ঊর্ধ্বতলে]

(B) প্রকরণ চলন।

উদাঃ—বনচাঁড়ালের পার্শ্বপত্রক দ্বয়ের ক্রমিক ওঠা ও নামা।

17. কতকগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর গমনাঙ্গের নাম লিখ।

Ans.	গমনাঙ্গের নাম	প্রাণীর নাম
(i)	ক্ষণপদ	অ্যামিবা
(ii)	ফলাজেলা	ইউগ্লিনা
(iii)	সিলিয়া	প্যারামেসিয়াম
(iv)	কর্ষিকা ও পাদচক্র	হাইড্রা
(v)	সিটা	কেঁচো
(vi)	সাকার	জোঁক
(vii)	খণ্ডাংশে যুক্ত তিন জোড়া পা ও দুজোড়া ডানা	পতঙ্গ [মশা, মাছি]
(viii)	সুইমারেটস্	চিংড়ি
(ix)	খণ্ডাংশে যুক্ত চারজোড়া পা	মাকড়সা, কাঁকড়াবিছে
(x)	প্যারাপোডিয়াম	নেরিস
(xi)	খণ্ডাংশে যুক্ত অসংখ্য পদ	কেন্নো
(xii)	মাংসল পদ	শামুক, ঝিনুক
(xiii)	নালিকাপদ বা টিউবফিট	তারামাছ

8. সলজেল মতবাদ কি?

Ans. অ্যামিবার গমন প্রসঙ্গে [ক্ষণপদের গঠন ও অবলুপ্তির দ্বারা] শ্রীমতি হাইম্যান প্রবর্তিত মতবাদ সলজেল মতবাদ নামে পরিচিত।

9. মানবদেহে কত প্রকারের অস্থিসন্ধি আছে?

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। মানবদেহের অস্থিসন্ধিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—

(i) অচল সন্ধি (ii) সচল সন্ধি।

সচল সন্ধি চার প্রকারের ঃ

(a) কব্জা সন্ধি [আমাদের হিউমেরাস ও রেডিও আলনার সংযোগস্থল]

(b) বল ও সকেট সন্ধি [আমাদের ফিমার ও অ্যাসিটিবুলাম-এর সংযোগস্থল]

(c) পিভোট সন্ধি [আমাদের মেরুদণ্ডের প্রথম কসেরুকা অ্যাটলাসের সাথে করোটির সংযোগস্থল]

(d) কৌণিক সন্ধি—[আমাদের গোড়ালির হাড়ের সাথে টিবিয়া ফিবিউলার সংযোগস্থল]

10. মানুষের চলন বা গমনে সাহায্যকারী পেশীগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

পেশীর ক্রিয়াশীলতার উপর ভিত্তি করে মানুষের চলন বা গমনে সাহায্যকারী পেশীগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) ফ্লেক্সর পেশী। (ii) এক্সটেনসর পেশী। (iii) অ্যাডাকটার পেশী। (iv) অ্যাবডাকটার পেশী।

11. বহিঃকঙ্কাল গমনে সাহায্য করে এমন একটি প্রাণীর উদাহরণ দাও।

Ans. আরশোলা।

12. 'রাইগর মরটিস্' বলতে কি বোঝ?

Ans. স্বাভাবিক অবস্থায় পেশী স্থিতিস্থাপক। কিন্তু জীবের মৃত্যু ঘটলে পেশীর স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা লুপ্ত হয়। ঐ অবস্থা অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক হীন শক্ত পেশীর অবস্থাকে 'রাইগর মরটিস্' বলে।

13. অধিকাংশ উদ্ভিদের গমন হয় না কেন?

Ans. অধিকাংশ উদ্ভিদ মাটির সাথে আটকে থাকায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে না।

14. মানুষের হাত কি প্রকারের লিভার?

Ans. তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

15. সিস্‌মোন্যাস্টি চলনের করণ কি?

Ans. লজ্জাবতী লতা স্পর্শ করলে স্পর্শ উত্তেজনার জন্য ঐ উদ্ভিদের পত্রমূলের কোষে বা পালভিনাসে রস-স্ফীতির তারতম্য ঘটার দরুন এরূপ চলন পরিলক্ষিত হয়।

16. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে মোট কতগুলি অস্থি আছে?

Ans. 206টি।

17. গমনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা হতে আসে?

Ans. অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (A.T.P.) থেকে।

18. মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে?

Ans. লঘু মস্তিষ্ক।

---

14 নং, কালিচরণ দত্ত রোড, কলিকাতা-61

মডেল ঃ সমস্যা ও সমাধান

মলয় খাটুয়া

আলোক নিঃসরণকারী ডায়োড (Light Emitting Diode) বা LED হল একটা P-N সংযোগ (junction) অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) যা দৃশ্যমান আলো নিঃসরণ করে। লাল, সবুজ এবং হলুদ রঙের LED বাজারে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে লাল LED-এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। সার্কিটে LED-কে সাধারণতঃ যে চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয় তা Fig (i)-এ দেখানো হয়েছে! চিহ্নটা প্রচলিত একমুখীকারক (rectifier) ডায়োডের মতই শুধু নিঃসরণকারী হিসেবে দুটো তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে (Fig 1) LED-এর দুটো পয়েন্ট বা Lead আছে। একটা ক্যাথোড (cathode) এবং অপরটা অ্যানোড। LED-এর ক্যাথোড ও অ্যানোড চেনার কয়েকটা উপায় আছে।

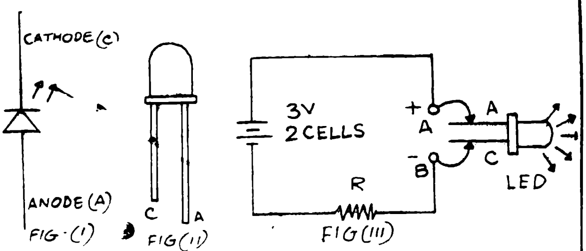

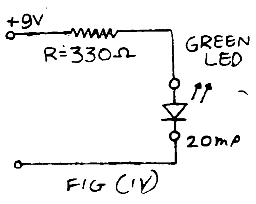

ক্যাথোড পয়েন্টটা সাধারণতঃ অ্যানোডের চেয়ে ছোটো হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্যাথোডের দিকটা একটু চাপা (flat) থাকে। যদি সন্দেহ থেকে যায় তবে একটা সহজ উপায়ে L.E.D-এর ক্যাথোড এবং অ্যানোড চিনে নিতে পার।

ছবির মতো দু'টো ড্রাই সেল ব্যাটারি এবং 330Ω একটা Resister নাও। Resistor-টা পরীক্ষাধীন LED-এর মধ্যে দিয়ে সম্মুখ প্রবাহকে (forward current) একটা নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখবে। LED-এর দু'প্রান্ত A ও B-এর সঙ্গে যুক্ত কর ; যদি না জ্বলে তবে LED-এর দু'প্রান্ত উল্টে লাগাও। যে অবস্থায় LED-টা জ্বলবে, তখন ব্যাটারির পজেটিভ (+) পয়েন্ট অর্থাৎ A-র সঙ্গে যুক্ত পয়েন্টটা হবে অ্যানোড এবং অপরটা হবে ক্যাথোড। কোনো অবস্থাতেই না জ্বললে বুঝতে হবে LED-টা খারাপ।

লাল LED-এর ক্ষেত্রে সম্মুখবর্তী বিভব পতন (forward voltage drop) সাধারণতঃ 1·6v, যেখানে সবুজ LED-এর 2·4v.

সিরিজে কোনো Resistor না লাগিয়ে LED কে ভোল্টেজ উৎসের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। কারণ এর সম্মুখবর্তী বিভব পতন খুবই কম। সিরিজ রেজিস্টরের অনুপস্থিতিতে LED-এর মধ্যে দিয়ে বেশী প্রবাহ গিয়ে এটাকে নষ্ট করে দেবে। নীচের সমীকরণের সাহায্যে DC সার্কিটে সিরিজ Resistor-এর মান হিসাব করা যাবে।

$$R = \frac{V_s - V_f}{I_f}$$

যেখানে, R = প্রয়োজনীয় সিরিজ রেজিস্টরের মান (ওহম)
V_s = D.C. সাপ্লাই ভোল্টেজ (ভোল্ট)
V_f = LED-র সম্মুখবর্তী বিভব পতন (ভোল্ট)
I_f = LED-র সম্মুখবর্তী প্রবাহ (অ্যাম্পীয়ার)

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধর, একটা সবুজ LED-কে 9v ব্যাটারির সাহায্যে 20mA = 0·02A সম্মুখ প্রবাহে জ্বালাতে হবে। আমরা জানি সবুজ LED-র সম্মুখ বিভব পতন প্রায় 2·4v.

$\therefore$ এখানে $V_s = 9v$
$V_f = 2{\cdot}4v$
$I_f = 0{\cdot}02A$

$$\therefore \quad R = \frac{9 - 2{\cdot}4}{0{\cdot}02} = 330\Omega$$

10% টলারেন্সের এবং ½ বা ¼ watt-এর Resistor ব্যবহার করলেই চলবে। LED-কে 20-30mA-এ জ্বালালেই যথেষ্ট উজ্জ্বলতা পাওয়া যাবে।

মলয় খাটুয়া, গ্রাম—মোল্লা, পোস্ট—মোল্লাহাট, হাওড়া।

প্রটেক্‌শন্‌ সার্কিট (Protection Circuit)

মলয় খাটুয়া

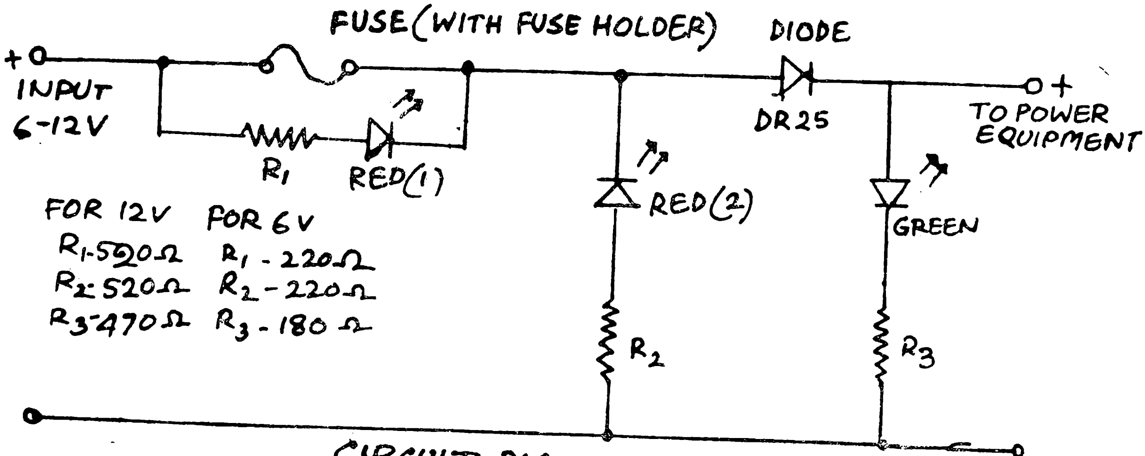

CIRCUIT DIAGRAM

ব্যাটারি-চালিত ইলেকট্রনিক্‌ যন্ত্রপাতিতে ব্যাটারির সঠিক পোলারিটি লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় ব্যক্তিগত ভুল বশতঃ ব্যাটারিরপজেটিভ (+) ও নেগেটিভ (−) উল্টে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তাতে যন্ত্রটির ক্ষতি হতে পারে। এই সার্কিটটি যন্ত্রটিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবে। যন্ত্রটি সঠিক পোলারিটিতে যুক্ত আছে কিনা জানাবে। সার্কিটটিতে তিনটি LED-এর মাধ্যমে তিন রকম নির্দেশ (Indication) পাওয়া যাবে।

1. যন্ত্রটি ব্যাটারির সাথে সঠিক পোলারিটিতে যুক্ত আছে কিনা (Power Indicator)।

2. ফিউজ (Fuse) নষ্ট হয়ে গেছে কিনা (Fuse Blown Indicator)।

3. পোলারিটি উল্টে গেছে কিনা (Polarity Reversal Idicator)।

সিরিজে যুক্ত ডায়োডটি কেবলমাত্র সঠিক পোলারিটিতেই পরিবাহী হবে এবং সবুজ LED-টি এই অবস্থায় জ্বলতে থাকবে। যদি কোনো কারণে পোলারিটি উল্টে যায় তখন RED (2) LED-টি জ্বলে উঠবে অথচ ডায়োডটি অপরিবাহী থাকায় যন্ত্রটির কোনো ক্ষতি হবে না। Fuse-টি নষ্ট হয়ে গেলে Fuse-এর সঙ্গে Parallel-এ যুক্ত RED (1) LED-টি জ্বলে উঠবে। সাধারণ অবস্থায় লাল LED দু'টি নিভে থাকবে। টেপ রেকর্ডার, অ্যামপ্লিফায়ার, 12v পোর্টেবল্‌ টিভি ইত্যাদিতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। 10 টাকার মধ্যেই সার্কিটটা তৈরি করা যাবে।

গ্রাম—মোল্লা, পোস্ট—মোল্লাহাট, জেলা—হাওড়া

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

১ম, ২য়, প্রতিখণ্ড দশ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৬

কীট পতঙ্গের কথা

মলয় ঘোষাল

ঘুরঘুরে

ইংরাজি নাম মোল ক্রিকেট (Mole Cricket)। ছুছুন্দর চ্চিংড়ে বলা যেতে পারে যদি ইংরাজি নামের অনুবাদ করা যায়। কিন্তু ঘুরঘুরে নামটা ঠিক কি কারনে এসেছে বলা শক্ত।

বৈজ্ঞানিক নাম গ্রাইলোটালপা গ্রাইলোটালপা (Gryllotalpa gryllotalpa) ঘুর ঘুরে এক অদ্ভুত ধরণের কীট। সামনের পা জোড়া দুটো বেলচার মত চওড়া আর বিশাল আকৃতির। এবং এই পায়ের চেহারার সঙ্গে ছুঁচোর পায়ের চেহারার মিল থেকেই এরা মোল ক্রিকেট।

এই অদ্ভুত দর্শন পায়ের সাহায্যে এরা মাটির মধ্যে গর্ত তৈরী করে থাকবার জন্যে। মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট পোকা মাকড় খায় এরা। খাবারের প্রয়োজন হলে এবং অন্য ছোট পোকা মাকড় না পেলে এরা কচি গাছের শিকড় অঙ্কুরিত গাছের চারা খেয়ে ফেলে। ফলে চাষ আবাদের পক্ষে এরা ক্ষতিকারক। যদিও এরা মূলত মাটির ভেতর থাকে, তবুও প্রায়ই, বিশেষতঃ রাতে এরা মাটির বাইরে বেরিয়ে আসে। যেসব জায়গায় আলো জ্বলে, উড়ে যায় সেই সব দিকেই। যদিও খুব একটা ভালো উড়তে পারে না।

মাটির ভেতর চার ধারে শক্ত আবরণ তৈরী করে স্ত্রী ঘুর ঘুরে কয়েক শো ডিম পাড়ে এক এক বারে। এবং সেই ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে প্রায় ছয়মাস লাগে।

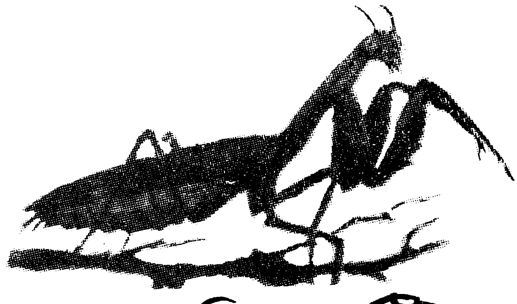

প্রেয়িং মেণ্টিস

প্রেয়িং মেণ্টিস, অর্থাৎ ধ্যান করে যে পোকা। জপ ধ্যান তো মানুষে করে। পোকা আবার কি ধ্যান করবে। আসলে খাবার ধরার জন্য এরা অপেক্ষা করে এমন ভাবে দেখে মনে হয় যেন সামানের হাত দুটো জোড়া করে ভবিষ্যতের পুণ্য অর্জনের আশায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম মেণ্টিস রেলিজিওসা (Mantis religiosa)। মোট তিন জোড়া পা এদের। সামনের পা দুটো একটু বিশেষ ভাবে গঠিত। শক্ত, মোটা, ধারে করাতের মত দাঁত। এই সামনের পা দুটো দিয়েই খাদ্য ধরে তড়িৎ গতিতে, আর ধরেই মুখে চালান দেয়। তারপর আস্তে আস্তে খেতে থাকে, আর ইতিমধ্যে সামনের প্রার্থনারত পা দুটো তৈরী হয়ে যায় আরো খাবারের প্রত্যাশায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে। সাধারণত এরা পোকা খায়। কখনো কখনো, এদেরই কোন বড় প্রজাতিকে, ছোট পাখি, গিরগিটি পর্যন্ত ধরতে দেখা গেছে।

তেমনি ভাবে এদের প্রধান শত্রুও হল পাখি আর বড় জাতের সরীসৃপ। যদিও এদের গায়ের সবুজ রং (কখনো কখনো পরিবেশ অনুযায়ী বাদামী বা হলদেটে রঙের ও হয়) পাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করে। এদের ডানাও যথেষ্ট মজবুত। যার সাহায্যে প্রয়োজনে অনেক খানি উড়ে যেতে পারে।

তবে এদের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এদের ডিম দেবার সময়টা। এদের স্বভাব হচ্ছে সামনের চলন্ত কোন পোকা মাকড় দেখলেই এরা ধরে খাবার জন্য। এমন কি স্ত্রী প্রেয়িং মেণ্টিস তার সামনে কোন চলন্ত পুরুষ মেণ্টিসকেও ছেড়ে কথা কয় না। ফলে মিলনের সময় প্রায়ই বহু পুরুষ মেণ্টিস স্ত্রী মেণ্টিস দ্বারা আক্রান্ত হয়। পূর্ণ জীবনে এরা অন্তত কুড়ি বার প্রায় একশো টা করে ডিম পাড়ে।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

এপ্রিল '89 VII—VIII

1. 'মন্দন'কে অন্য কোন্ নামে অভিহিত করা হয় ?

2. শূন্য স্থান পূরণ কর :

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\times \times \times \times \times}{\text{সময়}}$$

3. জীবকোষ কি দিয়ে গড়া ?

4. জোঁকের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি ?

5. কোন্ দলভুক্ত প্রাণির চোখের উপর-নিচে পাতা নেই ?

6. 'ম্যাডোনা' ছবি আঁকার জন্যে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কোন্ শিল্পী ?

7. প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ছয়টি বলে ছয়টি ছক্কা মারেন প্রথম কোন খেলোয়াড় ?

8. এটি কার ছবি ?

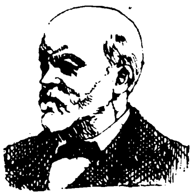

9. প্রথম 'রোমান্ সম্রাট' কে ছিলেন ?

10. আখ গাছের পর্ব থেকে কিরূপ মূল বেরোয় ?

গ্রেড II

এপ্রিল '89 IX—X

1. আবেগ প্রেরণ করাই কার কাজ ?
(ক) ডেণ্ড্রন (খ) অ্যাক্সন।

2. সাইটোকাইনিন হর্মোন এর কাজ কি ?

3. 'তানসেন' কে ছিলেন ?

4. কার চেষ্টায় 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপিত হয় ?

5. আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যের নাম কি ?

6. এক কিলোমিটার সমান কতো মাইল ?

7. এটি কার ছবি ?

8. 'অ্যাটমিক পাইল' এর আবিষ্কর্তা কে ?

9. কোন্ অরণ্যে 'লাল পাণ্ডা' প্রাণী পাওয়া যায় ?

10. উত্তর প্রদেশে চিপকো আন্দোলনের স্রষ্টা কে ?

গ্রেড III

এপ্রিল '89 XI—XII

1. 62°F উষ্ণতায় 10 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের আয়তন কতো ?

2. ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন MISA কতো সালে প্রবর্তিত হয় ?

3. ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানাটির নাম কি ?

4. ইনি ভারতের একজন খ্যাত-নামা ক্রিকেট খেলোয়াড়। এর নাম কি?

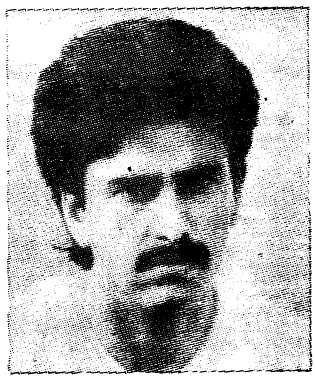

5. প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 5 গ্রাম অণু পরিমাণ অক্সিজেনের আয়তন কতো ?

6. কোন্ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় প্রথম 'অর্জুন পুরস্কার' লাভ করেন ?

7. কতো ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় কোন গ্যাসের আয়তন লোপ পায় ?

8. ক্যাথোড এবং এক্স রশ্মির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ?

9. ক্রিকেট খেলায় নো-বলে কতো রান হয় ?

10. 'এজরা কাপ' এর সঙ্গে কোন্ খেলার নাম যুক্ত ?

পাশাপাশি ঃ তরুন দাস

1. মার্কোপোলো যে দেশের নাম দেন 'জিল্যাংগু'। 3. জাহাজের বেগ, (6080 ফুট/ঘন্টা) কে যা বলা হয়। 4. মঙ্গলগ্রহের একটি উপগ্রহ। 6. কোনো বস্তুর [আয়তন (V) × ঘনত্ব (D)] কে যা বলা হয়। 9. রক্তহারক ব্যাধি। 12. ভারতের প্রথম জাতীয় অধ্যক্ষ। 14. 12 ডজনকে এক সাথে যা বলা হয়। 15. জাপানীরা তাঁদের দেশকে যা বলেন।

উপর নিচ ঃ

1. রামায়ণে বর্ণিত সীতাদেবীর অপর নাম। 2. 'সোনার আঁশ বা তন্তু'। 5. [বেগ (v) × সময় (t)] কে যা বলা হয়। 7. দেহে, যে নালিকা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তকে সর্বত্র নিয়ে যায়। 8. রাতে উষ্ণতা কমে গেলে জলীয়বাষ্প ছোট জলকণার রূপে ঘাস, পাতায় জমে, তখন একে যা বলা হয়। 10. ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি বা 'হলোগ্রাফিতে' আলোর উত্তম উৎস (যা 1960 সালে বিজ্ঞানী ম্যায়মান আবিষ্কার করেন) হিসাবে যা ব্যবহৃত হয়। 11. 'শাশ্বত শহর'। 13. যে মৌলকণাসমূহ বোস—সংখ্যায়ন মেনে চলে। 14. সূর্যের চতুর্দিকে যে জ্যোতিষ্কগুলো পরিক্রমণ করে।

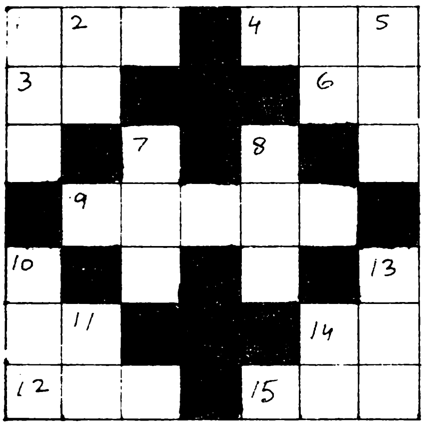

চিত্র—1

তরুণ দাস, 91, দীনবন্ধু মুখার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া 2

আই কিউ টেস্ট এপ্রিল '89

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত ? 1, 2, 4, 7, 11, 16 ...

2 নাইট্রোগ্লিসারিন নিচের কোন শ্রেণীভুক্ত ?

(a) অ্যাসিড, (b) অ্যালকোহল (c) এস্টার।

3. c—d থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল e—f হবে ?

4. 'জারমপ্লাজম' তত্ত্বের প্রবক্তার নাম—

(a) মুলার, (b) ভাইজম্যান, (c) মেণ্ডেল।

5. অ্যালোপেসিয়া হলো—

(a) স্নায়ুরোগ, (b) মাথার টাক পড়া, (c) রক্তশূন্যতা।

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

ফেব্রুয়ারি '89 গ্রেড-I এর সমাধান

1. প্রাথমিক একক তিনটিকে ভিত্তি করে অন্যান্য যে সমস্ত ভৌতরাশির একক গঠন করা যায়, তাদের বলা হয়— 'লব্ধ একক'। 2. শ্বেত তন্তুতে। 3. 2H লিখলে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে বোঝায় কিন্তু H_2 লিখলে একটি হাইড্রোজেন অণুকে বোঝায়। 4. একক ভর লোহার উষ্ণতা একক পরিমাণ বাড়াতে হলে 0·12 একক তাপের দরকার হয়। 5. গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ফসফরাস পেন্টাক্সাইড। 6. H_2S বিজারক এবং Cl_2 জারক দ্রব্য রূপে কাজ করে। 7. রাজা ফারুক। 8. জুডো। 9. আরাবল্লী। 10. হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ।

ফেব্রুয়ারি '89 গ্রেড-II এর সমাধান

1. (a) ষষ্ঠ হেনরি। 2. (c) পাকিস্তান। 3. (c) দস্তা। 4. গ্রীক শব্দ 'হরমোইন' থেকে। 5. (a) রসাল শল্ক পত্র। 6. রূপা হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কালো রঙের সিলভার সালফাইড (Ag_2S) যৌগ গঠন করে বলে। 7. ভিটামিন A ঘটিত প্রোটিন রঞ্জক। 8. সংবেদন ও চেষ্টীয় নার্ভের সংযোগে গঠিত। 9. (a) HNO_3. 10. রসায়ন বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক ভোলার।

ফেব্রুয়ারি '89 গ্রেড-III এর সমাধান

1. (a) বরফ। 2. (a) আরশোলা। 3, পিপীলিকাভুক। 4. (b) খেজুর। 5. (c) নীলাভ সবুজ। 6. বিভার। 7. এনামেল। 8 (c) তরল HCL। 9. হব্ (HOB)। 10. ছবির ডানদিকে রাকেশ শর্মা।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট/ফেব্রুয়ারি '89 এর সমাধান

1. EQHDNC. 2. 100x + y পয়সা। 3. (a) ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে। 4. (c) জার্মানী। 5. (a) হরিণ।

শব্দকূট সমাধান

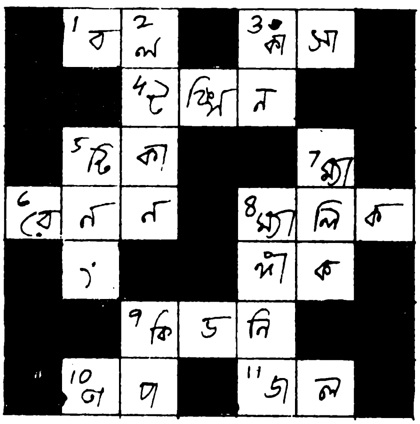

পৃথিবীর বৃহত্তম পুষ্প

এণাক্ষী বিশ্বাস

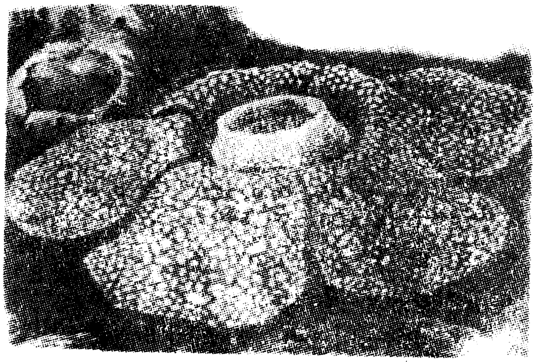

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্বে ভারতমহাসাগরে সুমাত্রা দ্বীপের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। সেই দ্বীপের আশ্চর্য ফুলের কথা আজ কারও অজানা নয়। যেটি আজ পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল—শুধু আকৃতিতেই বৃহৎ নয়। ওজনও অস্বাভাবিক, প্রায় 7—8 কিলোগ্রাম এই ফুলটির সবকিছুই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথচ যা খুবই চিত্তাকর্ষক। এই অদ্ভুত প্রকৃতির ফুলটির আবিষ্কার আজকের নয়।

1818 সালের কথা। সেই সময় বেনকুলেনের গভর্ণর ছিলেন স্যার ষ্টামফোর্ড র‍্যাফেল। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে সুমাত্রা দ্বীপটিতে অবসর বিনোদন করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মিসেস র‍্যাফেল, ডঃ জে. আরনলড ও আরও অনেকে। একদিন তারা জঙ্গলের মধ্যে পরিভ্রমণে বেড়িয়ে আবিষ্কার করলেন এই ফুলটি। তাঁরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলেন প্রায় এক মিটার ব্যাসের পাঁচটি পাঁপড়ি সমম্বিত এক অতিকায় প্রস্ফুটিত ফুল যার এক একটি পাঁপড়িই 30 সে.মি. লম্বা এবং ·03 সে.মি. পুরু। তাতে ফুলের সৌরভ নেই আছে পচা মাংসের গন্ধ। জল পাতা কিছুই নেই। পাঁপড়িগুলি কমলা রঙের, তাতে হলুদ রঙের ছিট। তাঁরা দেরী না করে ফুলটির ছবি এঁকে দিলেন রবার্ট ব্রাউনের কাছে। তিনি আবিষ্কর্তাদের নামানুসারে এই নতুন ফুলটির নামকরণ করলেন 'রাফলেসিয়া আরনলডি' এবং গোত্রের নাম দিলেন রাফলিসিয়েসী।

এরপর এই ফুলটিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা গেল ফুলটি পরজীবি অর্থাৎ সে খাদ্যের জন্য অন্য গাছের ওপর নির্ভরশীল। এই কারণেই পাতা নেই। একথা সকলেরই জানা পাতা উদ্ভিদের রন্ধনশালা। খাদ্যই যখন অন্য উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তখন রন্ধনশালারও প্রয়োজন নেই।

পোষক উদ্ভিদের দেহ থেকে সূক্ষাতিসূক্ষ সূতার মত অস্থানিক মূলের সাহায্যে খাদ্যরস শোষণ করে। এইগুলিকে হাইফি বলা হয়। ইহা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। এইগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। কেবলমাত্র অণুবীক্ষন যন্ত্রের নীচে ধরা পড়ে। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সরাসরি হাইফি বার হয় এবং পোষক উদ্ভিদের মূলের শিরাত্মক কলা সমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে। খাদ্যরস শোষণ করে ধীরে ধীরে পোষক উদ্ভিদের মূলের ছালটির একাংশে চা খাওয়ার পেয়ালার মত ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে ওঠে। পরে ঐ স্ফীত হয়ে যাওয়া ছালটি ফেটে গিয়ে কুঁড়ি বার হয়। কুঁড়িগুলি দেখতে অনেকটা বাধাকপির মত। এই কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে প্রায় 1 মিটার ব্যাসের বিরাটাকার ফুল হয়। কখনও কখনও 1 মিটার থেকেও অনেক বড় হয়। স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প আলাদা আলাদা হয়। ফুলের পাঁচটি পাঁপড়িগুলির মাঝখানে মুকুটের মত একটা রিঙ দেখা যায়, বলা হয় করোনা। পুং-পুষ্পের ক্ষেত্রে পরাগধানী গোলাকার ভাবে সাজানো থাকে। এই পরাগধানীগুলি বৃন্তহীন হয় এবং পরাগগুলি আকৃতিতে গোলাকার হয়।

স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্পপত্রটি কাপের আকৃতি হয় এবং দেখা গেছে এর ধারণ ক্ষমতা 240 আউন্স, এর ভেতর ডিম্বক থাকে। এই ডিম্বকটির একটি মাত্র ঘর হয় কিন্তু প্রচুর ডিম্বকোষ থাকে। অনেকগুলি গর্ভদণ্ড থাকে যেগুলি মিশে যায় মধ্যবর্তী স্তম্ভাকার মুকুটের সঙ্গে।

এই ফুলটির জীবন চক্র সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস সময় নেয়। ফুলটি ফোটে কয়েকদিনের জন্য।

ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পচা মাংসের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাছিদের আকৃষ্ট করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে ফুলে বসে। ইত্যবসরে পরাগযোগ ঘটে। অতঃপর বীজ প্রস্তুত হয়। বীজের সংখ্যা হয় প্রচুর। কারণ এর অধিকাংশ বীজই নষ্ট হয়ে যায়। ভিজে স্যাঁতসেতে পরিবেশে কেবলমাত্র cissus বৃক্ষের ছাল ফাটা অংশে বীজ অঙ্কুরিত হয়, অন্য কোথাও হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশালতার প্রতিযোগিতায় বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে ছত্রাক জাতীয়, পরজীবি উদ্ভিদ রাফলেসিয়া আরনলডি শুধু মূল ও ফুল বহন করে পচা মাংসের ঘ্রাণ বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ফুলের আসনটি দখল করে নিয়েছে।

ফটো : সুবল কৃষ্ণ দে

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত আই কিউ টেস্ট এবং ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1 2 3 প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগী হিসেবে যাদের নাম ঘোষিত হয়েছে—তাদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র সফল প্রতিযোগীদের পাঠানো হয় এবং অনুষ্ঠানের বিস্তৃত কর্মসূচী পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান না হলে সফল প্রতিযোগীদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে। তাই সফল প্রতিযোগীদের পত্রিকার পাতায় ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালক
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **পাপড়ি কোলে**, 85/24, জি.টি. রোড, (পশ্চিম) শ্রীরামপুর, হুগলী।

2. **দেবরাজ দত্ত**, প্রযত্নে দীপক দত্ত, বি.বি. 48/4, সেক্টর-I সল্টলেক সিটি, কলকাতা-700 064।

3. **তাপস চন্দ্র**, প্রযত্নে, দিবাকর চন্দ্র, 888, পূর্বসিঁথি রোড, কলকাতা-700 030।

4. **ধ্রুব দাস মহলানবীশ**, প্রযত্নে, মণি সরকার, আশ্রম পাড়া, নজরুল সরণী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

5. **শর্মিষ্ঠা ঘোষ**, প্রযত্নে, রণেন ঘোষ, মল্লিক গলি, খড়ুয়া বাজার, পোস্ট-চুঁচুড়া, হুগলী-712 101।

6. **উত্তমকুমার প্রধান**, গ্রাম-শুকুনিয়া, পোস্ট-শরপাই, কন্টাই, জেলা-মেদিনীপুর।

7. **রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী**, C/43, জয়শ্রী পার্ক, বেহালা, কলকাতা-700 034।

8. **তনুশ্রী দত্ত**, প্রযত্নে, বিদ্যুৎবরণ দত্ত, ফুলপুকুর রোড, (শীলবাগান) পোস্ট চুঁচুড়া, হুগলী-712 101।

9. **অরুণাভ ঘোষ**, পোস্ট + গ্রাম-সুলতানপুর, জেলা-বর্ধমান।

10. **সুদীপ্ত মুখার্জী**, মুখার্জী লজ, রায়গঞ্জ কলেজ পাড়া, রায়গঞ্জ, পঃ-দিনাজপুর।

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I এর সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সোনালী রায়**, (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, সুধীর কুমার রায়, ইন্দা (টায়ার হাউসের নিকট) পোস্ট—খড়্গপুর, জেলা-মেদিনীপুর।

2. **প্রদীপ দাস**, (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উটপাথর, পোস্ট—নিমপুরা, জেলা-মেদিনীপুর।

3. **অলোক চক্রবর্তী** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী, নিউ ডাঙ্গাল পাড়া, পোস্ট—সিউড়ি, জেলা-বীরভূম-731 101।

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ শিবানী ভৌমিক ঃ **24-পরগণা ঃ** গার্গী চ্যাটার্জী, অনাদি বিশ্বাস, টুম্পা সরকার, মৌমিতা ভট্টাচার্য ; **বর্ধমান ঃ** হিমাংশু ঘোষ, সুবীর কুমার গোস্বামী ; **বীরভূম ঃ** দেরায়ন চন্দ্র ; **বাঁকুড়া ঃ** রূপাঞ্জন সাহা ; **মালদহ ঃ** মানসী হাজরা চৌধুরী।

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **তন্ময় চক্রবর্তী**, প্রযত্নে, তারাপদ চক্রবর্তী, পাছালপাড়া, জোড়হাট, আন্দুল, হাওড়া।
2. **সমরজিৎ কুণ্ডু**, প্রযত্নে, অপূর্ব প্রসাদ কুণ্ডু, গ্রাম—কেন্দুয়াডিহি, জেলা-বাঁকুড়া।
3. **ঋত্বিক লাহা**, প্রযত্নে, শ্যামাপদ লাহা, গ্রাম+পোস্ট-আলিগ্রাম বর্ধমান।

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও একজন দিতে পেরেছে ঃ

বর্ধমান ঃ আলোদীপা লাহা।

ফেব্রুয়ারি '89-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **দিলীপ দাস**, প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উট পাথর, পোস্ট—নিমপুরা, জেলা—মেদিনীপুর।
2. **মিনতি দাস**, জয়রাম পুর, পোস্ট—শুকদেবপুর, জেলা—দঃ 24-পরগণা-743 503।
3. **সুধাংশু ঘোষ**, A3-4/2 ডি.কে. নগর দুর্গাপুর, বর্ধমান-713 210।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন এক একটি প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা আলাদা কাগজ ব্যবহার করে। একই কাগজে একাধিক প্রতিযোগিতার উত্তর (যেমন, ক্যুইজ কনটেস্ট এবং আই-কিউ-টেস্ট) একই সঙ্গে লিখলে আমাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। উত্তর পত্রে প্রেরকের নাও ও ঠিকানা এবং প্রতিযোগিতার কুপনটি সাদা বাঞ্ছনীয়।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

এপ্রিল '89 সংখ্যার ক্যুইজ কনস্টের উপহার

গ্রেড-1 **মনি বাগচীর**
কৃতি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র

গ্রেড-2 **মনি বাগচীর**
মেঘনাদ সাহা

গ্রেড-3 **মনি বাগচীর**
আচার্য জগদীশচন্দ্র

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..............................

....

বাড়ির ঠিকানা.......................

....

বয়স................ শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

লোভী দেশলাইকাঠি

অপরাজিত বসু

মিষ্ট কে না ভালবাসে ? সন্দেশ, রসগোল্লা, লজেন্স টফি থেকে শুরু করে গুড় মিছরি পর্যন্ত মিষ্টি-খোরদের হাত এড়াতে পারে না। একটু চোখ খুলে রাখলেই তোমরা এদের চারদিকে দেখতে পাবে। আজ তোমাদের মিষ্টি পছন্দ করে এমন একটি দেশলাই কাঠির কথা বলব। কেবল তেমন ব্যবস্থা করতে পারলে মিছরির দিকে দেশলাই কাঠি কেমন এগিয়ে যায়। একেবারে লোভের টান !

একটি বড় বাটি নাও; শুধু দেখে নিতে হবে যেন বাটিটা গভীর হয়। বাটি ভর্তি করে জল নাও। এরপর একটা বড় মিছরির টুকরোকে সুতোয় বেঁধে জলেতে একটু ডুবিয়ে রাখ। শুধু দেখবে, মিছরির খণ্ডটি যেন জলে ডুবে না যায়, জলে যেন একটুখানি ডুবে থাকে মাত্র। এই অবস্থায় মিছরি থেকে ইঞ্চি-খানেক দূরে একটি দেশলাই কাঠিকে জলে ভাসিয়ে দাও। লক্ষ্য কর, কাঠিটা কেমন মিছরির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন ওকে মিছরির লোভে পেয়েছে !

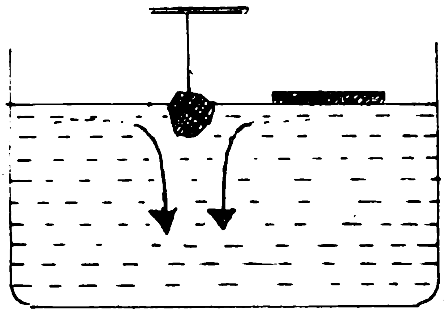

মিছরির দিকে কাঠির অদম্য টানের কারণ কি ? আশা করি লোভে নয়। মিছরি যেখানে জলে ডুবে আছে, সেখানে মিছরি জলে দ্রবীভূত হচ্ছে। দ্রবণ অংশটি চারপাশের জলের তুলনায় ভারী বলে তা নিচে নেমে যাচ্ছে, এবং তার স্থান পূর্ণ করার জন্য চারপাশের সাধারণ জল এগিয়ে আসছে। ফলে, জলের উপরিভাগে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে। ওই পরিচলন স্রোতের টানেই দেশলাই কাঠি মিছরির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পরীক্ষাটি সহজ, চেষ্টা করে দেখ—তোমরাও পারবে।

মস্তিষ্কের কাজ সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব ও যোগব্যায়াম

মস্কোস্থ এণ্ডোক্রিন সাইকিয়াট্রি বিষয়ক জাতীয় কেন্দ্রের প্রধান অ্যারন বেলাকিনের মতে মস্তিষ্ক হল দেহের একটি প্রধান এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি। তিনি বলেছেন যে মস্তিষ্ক-সৃষ্ট হরমোনের মধ্যে 300টিরও কিছু বেশী এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে এবং এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই হরমোনকে নিউরোপেপটাইড বলা হয়। বেলাকিন বলেছেন যে নিউর্যাল সংকেত সৃষ্টি করার সময় মস্তিষ্ক নিউরোপেপটাইড সৃষ্টি করে যার মধ্যে অ্যামিনো এ্যাসিডের স্বল্প-দীর্ঘ শৃঙ্খল রয়েছে। "প্রতিটি চিন্তাই মস্তিষ্কের এই সাইক্রোট্রপিক হরমোন প্রস্তুতিতে প্রেরণা দেয়।" মস্তিষ্কের হরমোন দুই ভাবে কাজ করে। এরা শুধু মস্তিষ্কের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় তথ্য নিয়ে যায় না বা মস্তিষ্কের অন্যান্য বিশ্লেষণী কাজে অংশ নেয় না, এরা শরীরের অন্যান্য অংশে নিউর্যাল সংকেত পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করে এবং অন্যান্য গ্রন্থি ও দেহযন্ত্রের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে মস্তিষ্ক প্রেরিত আদেশের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করে। নিউরোপেপটাইডরা এক ভাবে মস্তিষ্ক ও দেহের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এরা মানুষের মানসিক ও দৈহিক অবস্থার মধ্যে ক্রিয়া ঘটায় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এর ফলে আমরা যোগ, ধ্যান ও প্রাচ্যের অন্যান্য ঐতিহ্যগত নিরাময় পদ্ধতির নিউরোফিজিওলজিক্যাল কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। এই পদ্ধতিগুলি শরীরের কাজ-কর্ম মানসিকভাবে উৎসাহিত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ ও বহুমূত্রের চিকিৎসায় যোগ ও ধ্যান কার্যকর ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মোটর চালকদের সাহায্যে কম্পন-যন্ত্র

মস্কোয় অ্যাকাডেমিক ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ইনস্টিটিউট একটি অভিনব কম্পন-যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে যা মোটর-চালকদের পায়ে মাসাজ করে জড়তা ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করে। অনেকক্ষণ ধরে মোটর চালালে পায়ে জড়তা আসে ও এক-দুই সেকেণ্ডের জন্য দৃষ্টিহীনতা আসে, যার ফল অতীব বিপজ্জনক হতে পারে। এই কম্পন-যন্ত্র আড়ষ্টতা দূর করে ও রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে। যন্ত্রটি সেকেণ্ডে 60 বার কম্পনের সৃষ্টি করে।

সংবাদ ঃ ইউ. এস. এস. আর. কনসুলেট বিভাগ, কল-19

জলাতঙ্ক রোগ খুবই মারাত্মক-কিন্তু আপনি তা প্রতিরোধ করতে পারেন
কি ভাবে এই রোগ হয়?
– ক্ষিপ্ত পাগলা পশু - বিশেষ করে কুকুর কামড়ালে এই রোগ হয়ে থাকে।
– একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে কারন জলাতঙ্ক রোগ সারাবার কোন চিকিৎসা হয় না।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
– জলাতঙ্ক রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত পোশা কুকুরদের এই রোগ প্রতিরোধকারী টীকা দিয়ে নেবেন।
– রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের ধরতে এবং সরিয়ে ফেলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন কারন বেওয়ারিশ কুকুরেরা সাধারণতঃ ক্ষিপ্ত ও পাগল হয়ে পড়ে এবং তাদের মাধ্যমে গৃহপালিত কুকুরদের এই রোগ সংক্রামিত হয়।
– যদি আপনাকে কুকুরে কামড়ায় তবে ক্ষত স্থান সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যাবেন।
জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা
– ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা নিন।
সেন্ট্রাল হেলথ এডুকেশান ব্যুরো
ডি. জি. এইচ. এস. কোটলা রোড, নিউ দিল্লী।
davp 88/782

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

"ফোটন কণা কী ?"

উঃ আলোককে তরঙ্গধর্মী বলে মনে করা হলেও, সে কণিকাধর্মীও বটে। বিশেষ করে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট প্রভৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আলোককে কণিকাধর্মী বলে মনে করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে আলোকের সংগঠন ঐ কণিকাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ফোটন। পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, আলেকরশ্মির প্রত্যেকটি ফোটন কণিকায় অতি সামান্য অথচ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তিকে বলা হয় র‍্যাডিয়েণ্ট এনার্জি। অপরদিকে তরঙ্গধর্মের বিচারে আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দন সংখ্যার উপর তার এই বিকিরণ শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে থাকে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন ঃ

"ঠাণ্ডা লাগার কারণ কী"

জানতে চেয়েছেন রথীনকুমার ব্যানার্জী, কবুই, বর্ধমান থেকে।

(1) "খাদ্যপ্রাণ" সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো শতানন্দ ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, কাছাড়, আসাম থেকে ; (2) গ্রহরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে কেন—জানতে চেয়েছো অসীম, বিশ্বাস, বগুলা, নদীয়া থেকে ; (3) ভলকান গ্রহ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো মলয় মিত্র ও শমিত ঘোষ, গরলগাছা, হুগলী থেকে ; (4) আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহের সংখ্যা কত, জানতে চেয়েছো অঞ্জন বিশ্বাস, শিমূলতলা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া থেকে।

তোমাদের প্রশ্নের উত্তর মাত্র কয়েকটি সংখ্যার ব্যবধানে পরপর প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা কষ্ট করে একটু সংগ্রহ করে নেবে।

অন্যান্য প্রশ্নোত্তর

প্রঃ অনেকক্ষণ বসে থাকলে পা ঝিনঝিন করে কেন ? সুজয় মুখার্জী, রামরাজাতলা, হাওড়া।

উঃ আমাদের শরীরের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে স্নায়ু। শরীরের কোন অংশের স্নায়ুর উপর এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ ধরে চাপ পড়লে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া স্বরূপ তার অগ্রবর্তী অংশের উপর এক ধরনের সংবেদনের সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষণ পা গুটিয়ে বসে থাকলে তথাকার স্নায়ুসমূহের উপর ক্রমাগত ভাবে চাপ পড়তে থাকায় যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা ঝিনঝিন বলি।

প্রঃ মাংস খেলে হজম হয়ে যায় কিন্তু পাকস্থলীর কোষগুলো হজম হয়ে যায় না কেন? বাদল সরকার, হরিনাথপুর, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি।

উঃ আমাদের পাকস্থলীর মাংসপেশী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে। অথচ পাকস্থলীতে কোন কিছুকে হজম করতে হলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, পেপসিন ও অন্যান্য পাচকরস এবং কতকগুলো অনুঘটকের দরকার হয়ে থাকে। মাংস খেলে পাকস্থলীতে উপরোক্ত পাচকরসগুলোর সংস্পর্শে মাংস আসে এবং গলে যায়। কিন্তু পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর মাংসপেশী ঝিল্লির আবরণে আবৃত থাকায় পাচকরসের সংস্পর্শে আসতে পারে না এবং ঐ কারণে হজম হতে পারে না।

প্রঃ কৃত্রিমভাবে কেমন করে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয় ? প্রভাত ভট্টাচার্য, ঈশান ব্যানার্জী লেন, নবদ্বীপ, নদীয়া।

উঃ কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা জানি, পৃথিবীর জলমণ্ডলের জল জলীয় বাষ্পের আকারে উপরে উঠে যায়। ফলে চাপ হ্রাসের দরুণ আয়তনে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। ঠাণ্ডা হয়ে যখন তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের নিচে নেমে আসে তখন জলীয়বাষ্প তার চতুঃপার্শ্ববর্তী ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়ে ভাসতে থাকে। তখনই আমরা তাদের মেঘ বলি।

মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে হলে ঘনীভবনের ফলে জলকণাগুলোকে আকারে বড় হতে হয়। আর তখনই পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে সেগুলো বৃষ্টি বিন্দুর আকারে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। কিন্তু মেঘের জলকণাগুলো যদি (1) ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ না পায় কিংবা (2) ঘনীভূত হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টিবিন্দুগুলোকে শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুস্তর ভেদ করে

আসতে হয় তাহলে বৃষ্টি হয় না।

প্রথম ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য মেঘে শুষ্ক বরফ ছড়াতে পারলে অথবা বারুদ ও সিলভার আয়োডাইডের মিশ্রণকে তথায় পাঠিয়ে দিতে পারলে সুফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওদের দ্বারা উপযুক্ত ঘনীভবন কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। বলা বাহুল্য, শুষ্ক বরফ ছড়াতে হলে উড়োজাহাজের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং বারুদ ও সিলভার আয়োডাইডের মিশ্রণকে বেলুনের সাহায্যে উপরে পাঠাতে হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৃষ্টিবিন্দুগুলোকে উচ্চ-বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হলে বৃষ্টিবিন্দুরা পুনরায় বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং বৃষ্টি হয় না। এ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা সাধারণ লবণের মত জলাকর্ষী কোন পদার্থকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জলাকর্ষী পদার্থের উপস্থিতিতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং উষ্ণ বায়ুস্তর অতিক্রম করার সময় বাষ্পীভবনের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রঃ মশা প্রভৃতি প্রাণী—যারা রোগ জীবাণুদের বহন করে তাদের সেই সেই রোগ হয় না কেন? স্বরূপ পাত্র, নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনস্টিটিউশন।

উঃ জীবদেহে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা সাধারণতঃ পরজীবী। ওদের জীবনধারণ ও বংশবিস্তারের জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত পোষকের (Host)। যখনই কোন রোগ-জীবাণু পোষকের দেহকোষে স্থান নেয় এবং বংশবিস্তার করতে শুরু করে তখনই তাদের দেহ থেকে নির্গত হয় বিষাক্ত রস বা টক্সিন।

টক্সিনরা দু-রকমের। এক্সোটক্সিন এবং এনডোটক্সিন। এক্সোটক্সিনরা জীবাণুর দেহ থেকে নিঃসৃত হওয়ার পর বাইরে এসে পোষকের দেহরসের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তখনই ঘটে বিষক্রিয়া—তথা সৃষ্টি হয় রোগ। কিন্তু এনডোটক্সিনরা জীবাণুর দেহেই সঞ্চিত থাকে। পোষকদের দেহের তাপমাত্রা ও উৎসেচক যদি জীবাণুর-কোষপর্দাকে দ্রবীভূত করতে পারে তাহলেই পোষক হবে রোগাক্রান্ত। অতএব জীবাণুর দ্বারা সেই সব পোষকরাই রোগাক্রান্ত হয়, যারা (১) জীবাণুর জীবনধারণ ও বংশবিস্তারের উপযুক্ত, (২) জীবাণুদেহের কোষপর্দাকে দ্রবীভূত করানোর মত যারা উপযুক্ত উৎসেচক ও উপযুক্ত তাপমাত্রা সরবরাহের ক্ষমতা রাখে এবং (৩) জীবাণু দেহ থেকে নিঃসৃত টক্সিন যাদের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং যারা রোগজীবাণুদের বহন করে, তারা সেই রোগজীবাণুদের উপযুক্ত পোষক নয়। অর্থাৎ জীবাণুরা ওদের দেহে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে পারে বটে, কিন্তু বংশবিস্তারের মাধ্যমে টক্সিন উৎপাদন করতে পারে না। আর যদি বা করে তাহলে বাহক প্রাণীদের দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না এবং জীবাণুর কোষ পর্দাকে দ্রবীভূত করানোর মত উপযুক্ত তাপমাত্রা বা উৎসেচক থাকে না।

প্রঃ জল বর্ণহীন কিন্তু বরফ অস্বচ্ছ ও সাদা কেন? সুখেন্দু বিকাশ মিশ্র, 87/এ, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-2।

উঃ জলের ভেতর দিয়ে সূর্যের সাত রঙের আলোক-গুলোর সবাই চলে যেতে পারে। কোন একটিও প্রতিফলিত হতে পারে না। তাই জল স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। কিন্তু জল জমে বরফে পরিণত হলে সূর্যের সবকটি রঙের আলো সমান ভাবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। তাই বরফকে আমরা অস্বচ্ছ ও সাদা দেখি। আর ঐ একই কারণে কাচকে গুঁড়ো করে ফেললে গুঁড়োগুলোকে সাদা দেখায়।

প্রঃ জাত জিনিসটা কি? হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের যদি এঁটো খায় তাহলে কী জাত ধর্ম সব চলে যায়? পৃথ্বিশ সামন্ত, আমগেছিয়া-নন্দীগ্রাম-মেদিনীপুর।

উঃ জাত বলতে কিছু নেই। জাত ও ধর্ম দুটিই মানুষ সৃষ্টি করেছে।

এমন একদিন ছিল, যেদিন মানুষের কোন জাতও ছিল না, ধর্মও ছিল না। মানুষ-মানুষই ছিল। এবং এই অবস্থায় তাকে কাটাতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর। মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে মানুষের সমাজজীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠায় একশ্রেণীর ক্ষমতাশালী ও স্বার্থপর মানুষের দুরভিসন্ধির ফলে পেশাকে অবলম্বন করে জাতপাতের উদ্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের কল্পনা ও ঈশ্বরের নামে ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে শাসনকরার মানসিকতাও সেই থেকে বলা যায়।

ঈশ্বরের ও ধর্মের কল্পনা নাগরিক সভ্যতা পত্তনের কালেই হয়েছিল। সে সময় পৃথিবীর যে কোন সভ্য জাতি বহু দেবতার কল্পনা করেছিল এবং ধর্মেরও ধর্মাচরণের নীতি নিয়মও খাড়া করেছিল। পরবর্তীকালে সমাজব্যবস্থা আরও জটিলতর হয়ে উঠলে এবং মানুষের শুভবুদ্ধি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হতে থাকলে কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রঃ পৃথিবীতে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তি বলতে কী কিছু আছে? অরবিন্দ দে, সাদোর মুর্শিদাবাদ।

উঃ বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না এবং ঐশ্বরিক শক্তিকেও আমল দেয় না। বিজ্ঞানের মতে মানুষ নিজেই নিজের রূপকার। তার প্রতিভা ও কার্য-ক্ষমতা অর্জিত, উন্নতি-অবনতি, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির জন্য সে নিজে দায়ী।

সিনেমা দেখা

তখন প্রায় 1942-43 সাল, আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ বছর বয়সের একজন অধ্যাপক 'ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে' পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। অধ্যাপকটি ছিলেন আপনভোলা ও অত্যন্ত সাধাসিধা ধরনের। মাথাভর্তি পাখির-পালকের মতো একরাশ সাদা চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ঢাকার প্রায় সকলের কাছেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

একদিন তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে বায়না ধরল যে, সে সিনেমা দেখবে। অধ্যাপক তখন পড়াশুনা ও গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। কোথাও বেরোবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এদিকে, মেয়ের আব্দারও ফেলতে পারছেন না। শেষে, মেয়ের কথায় তাঁকে রাজী হতে হল।

এখন থেকে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। রাস্তায় এত বাস, ট্রাম, প্রাইভেট কার চলত না। সাধারণতঃ ঘোড়ার গাড়িতেই যাতায়াতের রেওয়াজ ছিল। কাজেই অধ্যাপক ঘোড়ার গাড়িতে করে মেয়েকে নিয়ে ঢাকার ভালো সিনেমা হল 'মুকুল'-এ গেলেন। এখন সেই হলের নাম হয়েছে, 'আজাদ'। ওখানে পৌঁছে দেখেন যে, তিনি তাঁর 'Money Bag' সঙ্গে আনেন নি। মেয়েকে হলের বাইরে এক-জায়গায় বসিয়ে রেখে, টাকা আনার জন্য ঐ গাড়িতেই ফিরে এলেন।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। কিন্তু, অধ্যাপক আর বাড়ির ভেতর থেকে বেরোচ্ছেন না। গাড়োয়ান অধ্যাপককে ভালোভাবেই চিনত। সে ভাবল, তিনি হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন। তাই, তার ডাকতে সাহস হলো না।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টা-দুই কেটে গেল! অধ্যাপকের দেখা নেই। তখন আর গাড়োয়ান থাকতে পারল না। বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলো যে, ঘরের টেবিলের ওপরে Money Bag পড়ে আছে, আর অধ্যাপক এক মনে কী সব লিখে চলেছেন। গাড়োয়ানের ডাকে তাঁর চৈতন্য হল।

'তাইতো! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এতক্ষণ দেরী করা ঠিক হয়নি। মেয়েটা এতক্ষণ ওখানে কী করছে!"—এই বলেই তিনি Money Bag সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে রওনা হয়ে গেলেন।

সিনেমা হলে, যেখানে মেয়েকে বসিয়ে রেখে ছিলেন, সেখানে তাঁকে পেলেন না।

অধ্যাপক, অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করলেন। শেষে, হলের কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিতে গেলেন। কর্তৃপক্ষ বললেন যে, মেয়ের মুখে অধ্যাপকের নাম শুনে তিনি তাঁকে সিনেমা হলে বসিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের খবর পেয়ে অধ্যাপক নিশ্চিন্ত হলেন। শেষে, সিনেমা ভাঙলে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

এই আপনভোলা অধ্যাপকটি কে জানো?

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু।'

অঙ্ককষা

নিখিল রঞ্জন বালা

আমি আজ তোমাদের একটি অঙ্কের সূত্র শেখাবো। সূত্রটি খুবই সহজ ও ছোট। এই সূত্রটির সাহায্যে কিছু কিছু অঙ্ক আছে যা তোমরা সহজেই কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্ভূলভাবে উত্তর বলে দিতে পারবে।

তাহলে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক কেমন?

রাজধানী এক্সপ্রেস হাওড়া হইতে দিল্লী ঘণ্টায় 100 মাইল বেগে যায় এবং ঘণ্টায় 120 মাইল বেগে ফিরিয়া আসে। রাজধানী এক্সপ্রেসের যাতায়াতের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় কত?

সূত্র: $\frac{2 \times V_1 \times V_2}{V_1 + V_2}$ { মনে রাখবে V_1 = যাওয়ার গতিবেগ, V_2 = আসার গতিবেগ।

∴ অঙ্কটা কষা যাক—

$$\frac{2 \times V_1 \times V_2}{V_1 + V_2}$$

$$= \frac{2 \times 100 \times 120}{100 + 120} \quad \{\text{মান বসিয়ে পাই}\}$$

$$= \frac{2 \times 12000}{\frac{200}{11}} = \frac{1200}{11} = 109\frac{1}{11} \text{ মাইল Ans.)}$$

এখন তোমরা তোমাদের ভাবে করে দেখ অঙ্কটি হয়েছে কিনা। আমি আশাকরি এই রকমের কোন অঙ্ক যদি থাকে তাহলে এই সূত্রে করে তোমরা উপকৃত হবে। এই সূত্রটি আমার নিজেরই আবিষ্কৃত।

সোনারপুর, দঃ 24 পরগণা, অষ্টমশ্রেণী।

গ্রামীন বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী

গত 17-21 ফেব্রুয়ারী 1989, মেদিনীপুর জেলার সাউটীয়া গ্রামে মিলনী সংঘের উদ্যোগে ও ভারত সরকারের STARD কার্যসূচীতে পাঁচ দিন ব্যাপী বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহন অঞ্চল পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীবিভুপদ আচার্য। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক কর্মশালা ও প্রদর্শণীর উদ্বোধন করেন ও গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান আন্দোলন এভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট লেখক শ্রীসুধাংশু পাত্র বলেন যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার কাজে এই কর্মশালা ও প্রদর্শনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মিলনী-সংঘের পক্ষে সঞ্জীব কর, কৌশিক কর অরূণ মহাপাত্র কর্মশালা ও প্রদর্শনীর উপযোগিতা ও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মসূচীতে তাঁদের সংঘের ভূমিকার বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

কর্মশালায় 10টি বিদ্যালয়ের প্রায় 50 জন নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী মোট ত্রিশ ঘন্টার ক্লাসে স্কুল-পাঠ্য বহির্ভুত আধুনিক বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পাঠ নেয় ও আলোচনা করে। I.I.T. খড়্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ মেদিনীপুর শাখা, বিড়লা মিউজিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাটী পরীক্ষা বিভাগ ও বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রায় 15 জন resource person ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কর্মশালায় অংশ নেন। পরিবেশ, শক্তি, কম্প্যুটার, বিজ্ঞানের ইতিহাস, উন্নত চাষবাস। ভূগর্ভস্থ জল, শতবার্ষিকী বৎসরের প্রেক্ষিতে রামন ও অন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীর জীবনী ও আবিষ্কার প্রভৃতি প্রায় 30টী বিষয় আলোচিত হয়। সাউটী বিদ্যালয়ের শিক্ষক অ্যামেচার জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্রীমনীন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ীর তৈরী দুটী দূরবীণ (3″ 31/2″ ব্যাস) দিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র গ্রহ-উপগ্রহ ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণে সাহায্য করেন। স্লাইড, ফিল্ম, হাতে-কলমে পরীক্ষা ও আকাশ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সহযোগ কর্মশালা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আকর্ষণ ছিল অজস্র পোস্টার, বৈজ্ঞানিক মডেলের আটটী স্টল, যার অধিকাংশ মডেল গ্রামীণ স্কুলের ছাত্রদের তৈরি। I.I.T. খড়্গপুর অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কম্পুটার সায়েন্স বিভাগের পার্সোনাল কম্প্যুটার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৃত্তিকা পরীক্ষার ভ্যন, BITM-এর সায়েন্স একজিবিশন ভ্যান ও ফিল্ম প্রদর্শনী, নানা যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ফিল্ম প্রদর্শনী ও বোড়াই অগ্নিবীনা শাখার ছোটদের অভিনীত যুদ্ধবিরোধী মুখোস নাটিকা।

প্রতিদিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রায় 600 ছাত্রছাত্রী ও প্রায় 500 সাধারণ মানুষ প্রদর্শনী উপভোগ করেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই কর্মশালা ও প্রদর্শনী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

প্রতিবেদক—প্রভাকর চন্দ্র ও দীনবন্ধু মাইতি

দ্বিতীয় সারাভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে 2য় সারা ভারত জন-বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী ছিল বিজ্ঞান পদযাত্রা ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় আলোচনা চক্র। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়—দুপুর 12টায় এবং মিছিল এসে মিলিত হয়-বিকেল 3টেয় বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের বিপরীতে। বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানলেখক ও বিজ্ঞানুরাগী অসংখ্য জনসাধারণ মিছিলে যোগদান করেন।

এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ চারদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মীয় মৌলবাদ, স্ব-নির্ভরতা, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি আলোচনা চক্রের অন্যতম বিষয় ছিল। সেমিনার উপসমিতির সভাপতিত্ব করেন ডঃ জয়ন্ত বসু।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

ন্যাশনাল সায়েন্স সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে গত 28 ফেব্রুয়ারি ও 4 মার্চ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপিত হল। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপ সিংহ, সমরজিৎ কর, অলক সেন প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখকগন উপস্থিত ছিলেন।

বুদ্ধি ও মেধাচর্চা

অমরনাথ রায়
নলেজ ক্যুইজ ১০, **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০,
অলক চক্রবর্তী
ফিজিক্স ক্যুইজ ১০,
অরূপরতন ভট্টাচার্য
গণিত ক্যুইজ ১০,
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন
লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ ১০,
অমরনাথ রায়
কেমিস্ট্রি ক্যুইজ ১০,
৬টি বই একসঙ্গে ॥ ক্যুইজ সেট ৫০,
রতনমোহন খাঁ
আরও গণিত ক্যুইজ ১০,
অমরনাথ রায়
আরও সায়েন্স ক্যুইজ ১০,
সমীর কুমার ঘোষ
আরও ফিজিক্স ক্যুইজ ১০,
তারকমোহন দাস ও অসিতকুমার দাস
আরও বায়োলজি ক্যুইজ ১০,
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমনির ছড়া ১৫,
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৪০,
হাসনান আহসান
স্পোর্টস ক্যুইজ ১৬,
পার্থসারথি চক্রবর্তী
বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০,
অরূপরতন ভট্টাচার্য
যুক্তি তর্ক হেঁয়ালি ৮,
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫,
স্যামলয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০,

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮,
জ্ঞান বিজ্ঞানের মজার খেলা ১০,
স্টুডেন্টস নলেজ গাইড ১ম ও ২য়।
প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
পশুপক্ষী ২০,
বনেজঙ্গলে ১৫,
অজয় হোম
বাংলার পাখি ৩০,
চেনা-অচেনা পাখি ৩০,
বিচিত্র জীবজন্তু ১২,
সুকুমার দে সরকার
বনের গল্প ৮,
অমিতাভ চক্রবর্তী
ছোটদের বাঘের গল্প ৮,
কেনেথ আন্ডার সন
শিবানীপল্লীর কালোচিতা ২০,
মানুষ খেকোর বিভীষিকা ১৫,

উপন্যাস সাহিত্য সংগ্রহ ও বিবিধ প্রবন্ধ
বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ বিনোদিনী ২০,
বিষ্ণুপদ পাণ্ডা
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত ৩০,
বিপিন বিহারী গুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ ৩০,
নারায়ণ চৌধুরী
সমাজপ্রবাহে সাহিত্য ২০,
দেওয়ান কর্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত ও
মোহিত রায় সম্পাদিত
ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত ৬০,
সুকুমার ভট্টাচার্য
সবাই মিলে ৬,
দক্ষিণারঞ্জন বসু
কখনো সম্রাজ্ঞী ৮,
অমিত রায়
দুই রমণীর গপ্পো ১০,
মনিবাগচি
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬,
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুনশী রামরাম বসু ২০,
রমাপদ চৌধুরী
আমরা সবাই ১০,
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন।
১ম ও ২য় ॥ প্রতি খণ্ড ৩৫,
শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৫,

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 8 TH YR VOL 2

পৃথিবী সৌরজগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের অজানা রোমাঞ্চকর অধ্যায়

রাতের আকাশে উজ্জ্বল আলোর চলাফেরা মানুষকে বরাবরই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু দূরবীণের আবিষ্কারের ফলে আমরা সৌরমন্ডলীর গ্রহগুলির অজানা তথ্য সব জানতে পেরেছি। জেনেছি নক্ষত্রের পরিচয়—ধীরে ধীরে চিনতে শিখেছি সপ্তর্ষি ও কালপুরুষকে। যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি—সেই ভূখণ্ডই তো সৌরমন্ডলীর একটি গ্রহ—অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু কি করে সৃষ্টি হল আমাদের এই পৃথিবীর ? চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্ররাজির সৃষ্টি রহস্যের সব কথাই কি আজ আমরা জানতে পেরেছি ?

গত দু দশক ধরে সৃষ্টি রহস্যের যে চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তারই সমাবেশ ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী পরিচয় ১০৲

বিমান বসু

গ্রহ পরিচয় ১৫৲

নক্ষত্র পরিচয় ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম ঃ 5·00 টাকা। [redacted]